দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা।। ১০ মার্চ - ২০১৪।।
২৫ ফাল্গুন - ১৪২০।। website : www.eswastika.com

শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

আঞ্চলিক দলগুলি রাজ্যের ক্ষুদ্র স্বার্থে কাজ করে, তাই শুধু জাতীয় দলকেই ভোট দিন □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : আলিমুদ্দিনের কালবেলা, বুদ্ধবাবুর দুঃসময় □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

এ গণতন্ত্র সে গণতন্ত্র নয়! □ মৃগাঙ্ককৃষ্ণ রায় □ ১২

শ্রীচৈতন্যের সাম্যবাদ □ অসিত বরণ চট্টোপাধ্যায় □ ১৪

বিজ্ঞানের আলোয় দোল ও দীপাবলি □ সৌমেন নিয়োগী □ ১৭

বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে এবার কাজ হোক □ শ্যামল কুমার হাতি □ ২০

রাজবাড়ির দোল □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২১

চৈতন্য-জননী শচীদেবী □ রূপশ্রী দত্ত □ ২২

বৈদিক গণিত □ প্রাণতোষ বর্ধন □ ২৩

লাল পার্টি তাদের যে নামেই ডাকা হোক না কেন তাদের মানসিকতা একই □ বলবীর পুঞ্জ □ ২৭

ঢিপির নিচে বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ধার □ ২৯

দেশ রক্ষার জন্য সহিংস হওয়া বাধ্যতামূলক □ অমলেশ মিশ্র □ ৩২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

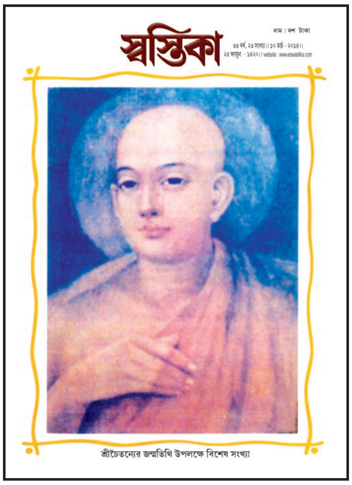

পৃঃ ১৪-১৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □

অন্যরকম : ৩৩ □ □ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭

□ □ রঙ্গম : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রচ্ছদ পরিচিতি : শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মূল চিত্র। আনুমানিক ১৫২০ খৃঃ গৃহীত। সৌজন্যে : মহামান্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব, ওড়িশার তৎকালীন শাসক।

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ২৫ ফাল্গুন , ১৪২০ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৫, ১০ মার্চ - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মোদীর টীম

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিটি রাজ্যের পরিস্থিতি ও তথ্য ধরে ধরে বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রচার অভিযানে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপাত্মক বক্তব্যগুলিকে জনতার মনের গভীরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। সর্বাধুনিক কৃৎকৌশলের সহায়তা নিয়ে তাঁকে সেইসব তথ্যসম্ভার সরবরাহ করে চলেছে এক নেপথ্য বাহিনী— মোদীর টীম। এই নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ। লিখেছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাম একই থাকছে— ১০ টাকা মাত্র। সত্বর কপি বুক করুন।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE ® PURE
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নতুন ভোটার পুরানো রাজনীতি

নির্বাচন কমিশন জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান-সহ নির্বাচন সংক্রান্ত যে সকল তথ্যাদি প্রকাশ করিয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় যে ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করিবে প্রথমবারের ভোটদাতারা। অর্থাৎ আজকের ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক নয়— আজকেরই নাগরিক। সাধারণভাবে হিসাবে দেখা যাইতেছে, প্রতিটি লোকসভা আসনে গড়পড়তা ১.৭৯ লক্ষ নতুন ভোটার রহিয়াছে। এই নতুন ভোটারদের বয়স ১৮-১৯ বছরের মধ্যে। প্রশ্ন হইল, নতুন প্রজন্মের ভোটদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধির তাৎপর্য কি? কি ধরনের পরিবর্তনের তাহারা প্রতিনিধিত্ব করে? ১৮ হইতে ২২ বছর বয়সী নতুন ভোটাররা এক ভিন্ন পরিবেশে বড় হইয়াছে এবং তাহাদের প্রধান আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা-চিন্তাগুলি ভোট প্রার্থীদের হইতে ভিন্ন। গত তিন দশকে এই দেশে যে নির্ণায়ক রাজনৈতিক ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে, এই প্রজন্মের কাছে তাহা ইতিহাস। এইসব ঘটনার মধ্যে ১৯৮৪-র দিল্লীর দাঙ্গা ও ২০০২-এর গুজরাটের দাঙ্গাও রহিয়াছে। এই কয়েক দশকের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি, শহরগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। একদা নাগরিকরা যে সকল অসুবিধা ভোগ করিত, এখন আর তাহা করিতে রাজি নয়। এখন বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের সঙ্গেই তাহারা যোগাযোগ করিতে সমর্থ। তাহাদের পিতামাতা এই সুযোগ পায় নাই। শক্তিশালী সংবাদমাধ্যম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে গ্রামীণ ভারতও আর পিছাইয়া নাই, শহরের সুখসুবিধাগুলির বিষয়ে তাহাদের ধারণা স্পষ্ট।

নতুন ভোটারদের কারণে কোন দল উপকৃত হইবে—এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নয়। তবে এই কথা বলা যায় যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন ভোটারদের ভাবনা-চিন্তা বা মূল্যবোধ প্রভাব বিস্তার করিবে। ইউপিএ-২ সরকারকে নাড়া দেওয়ার মতো প্রতিবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে ইহা স্পষ্ট যে তাহারা ক্লান্তিহীন ও উৎসাহে ভরপুর। দুর্নীতি ও যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদে তাহারা আন্দোলন করিতে প্রস্তুত। তাহারা আরও উন্নত স্কুল, নৈপুণ্য অর্জন, কাজ, পরিষেবা এবং পার্থিব প্রগতি চায়। এক দশক আগের পরিকাঠামো তাহাদের কাছে আর যথেষ্ট নয়। যে সকল সুবিধা তাহারা পাইতেছে এজন্য তাহাদের নিকট হইতে ধন্যবাদও আশা করা যায় না। তাই রাজনৈতিক দলগুলিকে আরও নমনীয় হইতে হইবে এবং যুবসমাজ ও আঞ্চলিক বিষয় সম্পর্কে তাহাদের পুরানো ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যুবসমাজের ভাবনা-চিন্তাগুলি প্রতিফলিত হয় এমন বিষয়গুলিকে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

যখন প্রজন্মগত পরিবর্তন বাস্তব অবস্থাকে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে পারে না, এবং পূর্ব ধ্যান-ধারণার বশবর্তী একটি শক্তি বিদ্যমান, তখন সেইটিও প্রগতিশীল দলগুলি উপেক্ষা করিতে পারে না। তাই নবীন প্রজন্মের ভোটদাতাদের ভাবনা-চিন্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরাতন ভাব-ভাবনাকেও স্মরণ রাখিতে হইবে। সেইসঙ্গে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলগুলিকে নতুন ভোটদাতাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজেদের কর্মসূচি পরিমার্জিত করিতে হইবে। এই দিকে তাকাইয়া দলগুলি অবশ্য নিজেদের কর্মসূচি পরিমার্জন করিতেছে—যেমন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি এখন উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং যুবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। প্রত্যেকেই এখন সেইসব কর্মসূচির উপর কথা বলিতেছে যাহা নবীন প্রজন্মের ভোটদাতাদের আকর্ষণ করিতে পারে। নবীন প্রজন্মের ভোটদাতারা যাহাতে তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে এমন কর্মসূচিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।

তোমরা কি মনে কর প্রতিটি নারীর অন্তরে যে দেবী রয়েছেন, তাঁকে মুহূর্তের জন্যও ছলনা করা যায়? কখনোই তা হয়নি, হবেও না কখনও। সেই দেবী সবসময় নিজেকে প্রকাশ করছেন। (পুরুষ-মানুষের অন্তরের) যে-কোনও ছলনা অনিবার্যভাবে তাঁর কাছে ধরা পড়ে। সত্যের গৌরব, আধ্যাত্মিকতার আলো, পবিত্রতার মহিমা—সবকিছুই সেই দেবী নির্ভুলভাবে অনুভব করেন। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা অর্জন করতে এই পবিত্রতার একান্ত প্রয়োজন।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারতীয়রা পরিবর্তনের জন্য উদগ্রীব : মার্কিন সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন ॥ না, এখন আর শুধু নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপি কর্মী সমর্থকরাই নয়, কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হোক এটা চাইছে দেশের সত্তর শতাংশ মানুষ— এমনই তথ্য উঠে এল Pew Research Center নামক এক মার্কিন সংস্থার সমীক্ষায়।

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, প্রতি ১০ জন ভারতীয়ের মধ্যে ৭ জনই ইউপিএ সরকারের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট এবং তারা পরিবর্তনের পক্ষে। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে চালানো এই সমীক্ষায় আরো দেখা যাচ্ছে— সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করছে এবং পরিবর্তন চাইছে এদেশের প্রায় ৭২ শতাংশ পুরুষ ও ৬৭ শতাংশ নারী। এই সমীক্ষা অনুযায়ী বিজেপি-র পক্ষে রয়েছে ৭২ শতাংশ তরুণ প্রজন্ম (১৮-২৯ বয়সী), পঞ্চাশ বছর বা তার বেশী বয়সীদের মধ্যে ৬৯ শতাংশ, প্রাথমিক শিক্ষাটুকু পেয়েছে বা তাও পায়নি এমনদের মধ্যে ৬৭ শতাংশ, স্নাতক স্তর বা তার থেকে বেশি পড়াশোনা করেছে তাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ, শহর বা মফস্‌সলের লোকেদের মধ্যে ৭২ শতাংশ এবং প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার ৬৮ শতাংশ মানুষ।

ভারতীয়রা পরিবর্তন চাইছে সেটা বোঝা গেল, কিন্তু সরকারে কাকে চাইছে? সমীক্ষার ফল অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, বিজেপি কংগ্রেসের চেয়ে তিন গুণ আসন বেশি পেতে চলেছে। সামগ্রিকভাবে প্রায় ৭৮ শতাংশ ভারতীয়ের পছন্দ নরেন্দ্র মোদী, ৬৩ শতাংশ মানুষ চাইছে কেন্দ্রে নতুন সরকারের নেতৃত্ব দিক বিজেপি। মাত্র ২৯ শতাংশ মানুষ চাইছে কংগ্রেসকে এবং ১২ শতাংশ অন্যান্যদের। শুধু তাই নয়, সমীক্ষাতে এটাও দেখা যাচ্ছে যে— বিভিন্ন বয়সের মানুষদের মধ্যে গ্রামীণ ও শহরে এলাকায় বিজেপি-র সমর্থন প্রতিনিয়িত বেড়েই চলেছে, সঙ্গে বাড়ছে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা। ৬০ শতাংশ মানুষের কাছে নরেন্দ্র মোদী 'সবচেয়ে পছন্দের', যেখানে রাহুল গান্ধীর গ্রহণযোগ্যতা মাত্র ২৩ শতাংশ।

পাঁচ থেকে ছ'টা সাধারণ ইস্যুর উপরেও এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, যার প্রত্যকটাতেই তিরিশের বেশি পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। সমীক্ষানুযায়ী, দুর্নীতি রোধে ৫৬ শতাংশ মানুষ চাইছে বিজেপি-কে, ১৭ শতাংশ চাইছে কংগ্রেসকে। বেকারত্বের সমাধানে ৫৮ শতাংশ মানুষ চাইছে বিজেপিকে, ২০ শতাংশ মানুষ চাইছে কংগ্রেসকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কারা কমাতে পারে? ৫৬ শতাংশ মানুষের মত অনুযায়ী বিজেপি, ১৭ শতাংশ মানুষের মত কংগ্রেসের দিকে। সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে কঠোর ভূমিকা নিতে পারে বিজেপি এটা মনে করে দেশের ৫৬ শতাংশ মানুষ, অন্যদিকে ২০ শতাংশ মানুষ মনে করছে এটা পারে কংগ্রেস। দরিদ্র মানুষের স্বার্থে সরকার বিজেপি দিতে পারে এটা মনে করে ৫৪ শতাংশ মানুষ, অপরপক্ষে কংগ্রেসের দিকে এই ইস্যুতে সমর্থন মাত্র ২১ শতাংশ লোকের।

অর্থাৎ একটা বিষয় খুব পরিষ্কার যে— বিজেপি-র প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন যেমন বাড়ছে, তেমনি চড়ছে প্রত্যাশার পারদ।

সমীক্ষার ফল অনুযায়ী যদি সত্যিই বিজেপি ক্ষমতায় আসে তবে এই প্রত্যাশার চাপ মোদী সরকার কেমনভাবে সামলাবেন সেটাই এখন দেখার।

১৫ হাজার সন্ত মোদীর পক্ষে প্রচার চালাবেন : সিংহল

নিজস্ব প্রতিবেদন ॥ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন করার জন্য সন্তসমাজ স্বীকৃতি দিয়েছেন। গত বছর মহাকুম্ভের সময়ই সন্তসমাজ মোদীকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গত ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি প্রয়াগের মাঘমেলায় কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলীর পূজ্য সন্তদের বৈঠক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল। বৈঠকের পরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংরক্ষক অশোক সিংহল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সন্তসমাজ আগামী লোকসভা ভোটের জন্য জনজাগরণের পরিকল্পনা করেছেন। জগদ্গুরু, মহামণ্ডলেশ্বর, সন্ত, মহন্ত সবাই এই অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন। সন্তদের বক্তব্য, তাঁরা কোনো দলের সমর্থক নয় কিন্তু মোদীর সমর্থনে ভোট চাইবেন।

অশোক সিংহল বলেন— সারা দেশে এই অভিযানে ১৫ হাজার সন্ত অংশগ্রহণ করবেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের লুঠ ও ভ্রষ্টাচারের মহাসঙ্কট থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য এবং হিন্দুসমাজের ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত সমাজ প্রচার চালাবেন। শ্রী সিংহল বলেন— শ্রীরাম জন্মভূমি, গোরক্ষা ও গঙ্গারক্ষার বিষয় প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে মহত্ত্বপূর্ণ। ধর্মান্তরকরণ ও হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য সন্ত সমাজ চিন্তিত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সন্তদের এই জনজাগরণ কর্মসূচিকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

ফতোয়া বেআইনি, বক্তব্য সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন॥ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি এক ঐতিহাসিক রায়ে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ‘ফতোয়া’-কে বেআইনি বলে মন্তব্য করল। আইনি স্বীকৃতি বিহীন মুসলমান ধর্মীয় নেতৃত্বের দেওয়া ফতোয়া মানুষের ওপর জোর করে চাপানো যাবে না বলার পাশাপাশি ফতোয়া মানা ঐচ্ছিক, আবশ্যিক নয় বলেও রায় দিয়েছে আদালত। একইসঙ্গে এহেন ‘ফতোয়া’র পাল্লায় পড়ে সাধারণ মানুষ অসুবিধা কিংবা বিপদে পড়লে তাঁদের উদ্ধারের ব্যাপারেও প্রশাসনিক ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিশ্বলোচন মদনের দাখিল করা জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি সি কে প্রসাদ ও পিসি ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁদের রায়ে জানান যে মুসলমান ধর্মগুরুদের ‘ফতোয়া’র কোনও আইনি বৈধতাই নেই। শ্রীমদন তাঁর আবেদনে দেখান গোটা দেশেই সমান্তরালভাবে শরিয়তী আদালতের সংখ্যা ব্যাঙের ছাতার মতো কীভাবে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলছে। এহেন শরিয়তী আদালতের নির্দেশ (পড়ুন ‘ফতোয়া’) যে আদতে বেআইনি সে ব্যাপারে সরব হয়েছিলেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয় মুসলমান ‘মুফতি’রা যেভাবে তাদের সম্প্রদায়ের ওপর আধিপত্য কায়েম করে ‘নির্দেশ’ দেবার চেষ্টা করে তাও বেআইনি। কোর্টের বক্তব্য, মুফতি-রা যে কোনও বিষয়ে যা খুশি ‘নির্দেশ’ জারি করতেই পারে। কিন্তু আইনের চোখে তা তাদের ‘ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি’ বলেই বিবেচিত হবে। যদি জোর-জবরদস্তি করা হয় এ নিয়ে তবে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতেই হবে।

তবে আদালতের রায়ে বাস্তবে কতটা প্রতিফলিত করা সম্ভব তা নিয়ে সন্দিহান খোদ বিচারকরাই। কারণ মুসলমান ধর্মগুরুদের প্রভাব তাদের সমাজের ওপর যথেষ্ট। অশিক্ষা আর কুসংস্কারের আবরণে ঢেকে থাকা মানুষেরা তাদের ধর্মগুরুদের যতটা ভক্তি করে, তার চেয়ে বেশি করে ভয়। ফতোয়া না মানলে ‘সামাজিক বয়কটে’র ভয়ই এই ফতোয়া-বিরোধিতায় সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে বলে সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত। পাশাপাশি রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিও এ ধরনের ফতোয়া বন্ধে অন্যতম বড়ো বাধা বলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কারণ এই ফতোয়া-ই একশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের ভোটবাক্সে সমস্ত মুসলমান সমাজের ভোট একত্রিত হতে সাহায্য করে। ‘সংখ্যালঘু তোষণ’ যে আদতে মুসলমান সমাজের ধর্মান্ধ ধর্মগুরুদের তুষ্টিরই কৌশল তা অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকা একটা সমাজকে কে বোঝাবে? এ প্রশ্নটাই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে আদালতি মহলে।

ডোনিজার-এর দ্বিতীয় বইটিও প্রত্যাহারের দাবি জানালো শিক্ষা বাঁচাও সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন॥ ‘দি হিন্দুস : অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি’-র পর আবার মার্কিন লেখক ওয়েনডি ডোনিজার (wendy Doniger) হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে অপমানসূচক বক্তব্য প্রকাশ করেছেন সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর ‘অন হিন্দুইজম’ গ্রন্থে (২০১৩)। দিল্লী কেন্দ্রিক ‘শিক্ষা বাঁচাও সমিতি’ (এস বি এ এস) এই অভিযোগ করেছে। উল্লেখ্য, এই সমিতির আন্দোলনের ফলে ডোনিজারের প্রথম হিন্দুত্ব বিরোধী বইটি তার প্রকাশক পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া ভারতীয় বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। এবারও শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি (এস বি এ এস) বইটির প্রকাশক আলেপ বুক (Aleph Book) কোম্পানির কাছে বইটির বিক্রি বন্ধ ও প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতির আহ্বায়ক এবারও বলেছেন, আগের বইটির মতো ‘অন হিন্দুইজম’-ও ‘ক্ষতিকর ও অপমানকর।’ লেখিকা হিন্দু দেবদেবী সম্পর্কে রুচিহীন শব্দ ব্যবহার করেছেন। ভারত ও হিন্দু সংস্কৃতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যে ছক কষেছেন, এই বই প্রকাশ সেই ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। (কার্ল) মার্কস ও (টমাস) মেকলের ভাবশিষ্যরাই এই ষড়যন্ত্রের হোতা।

এস বি এ এস-এর যুগ্ম আহ্বায়ক অতুল কোঠারি বলেছেন, প্রকাশক সংস্থা বইটি এক সপ্তাহের মধ্যে বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেবে বলে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদি তারা তা না করে তবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কেননা এইসব তথাকথিত গবেষক ভারত ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে চাইছে। উল্লেখ্য অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রিতে প্রকাশিত ভারতের মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীরকে দেখানো হয়নি।

সংবাদ প্রতিবেদন

পাকিস্তানের স্কুলে চলেছে একমুখী বাধ্যতামূলক পাঠক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ছেষট্টি বছর ধরে ভারতের কাছে ছিল মহম্মদ আলি জিন্নার এক স্মরণীয় বক্তৃতা। গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের পক্ষ থেকে তা তুলে দেওয়া হয়েছে রেডিও পাকিস্তানের হাতে। পাকিস্তানের জন্মের তিনদিন আগে ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট জিন্না বক্তৃতা দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের জন্ম ১৪ আগস্ট ১৯৪৭। জিন্না বক্তৃতা দিয়েছিলেন নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রথম প্রশাসনিক অধিবেশনে। তখনও দেশ ভাগ হয়নি আনুষ্ঠানিকভাবে। প্রস্তুতি চলেছে পুরোদমে। জিন্না যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা টেপ রেকর্ডারে ধরা ছিল। ভারত সরকারের জিম্মায় অত্যন্ত যত্নে রাখা জিন্নার বক্তৃতা পাকিস্তান রেডিওর হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সদিচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে।

জিন্না ছিলেন স্পষ্টবাদী মানুষ। নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তিনি ঘোষণা করেছিলেন রাষ্ট্রের নীতি ও আদর্শের কথা। তিনি বলেছিলেন জনগণের উদ্দেশে, ‘‘আপনারা মুক্ত মনে যেতে পারেন মন্দিরে, স্বাধীনভাবে যেতে পারেন মসজিদে এবং ধর্মচর্চার প্রয়োজনে পাকিস্তানের যেকোনো জায়গার ধর্মস্থানে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা প্রত্যেকে নাগরিক এবং সমস্তরের নাগরিক একটি রাষ্ট্রের। এখন আমি মনে করি সেটা সামনে রেখে এগোতে হবে আমাদের। সেটাই হবে আদর্শ। দেখতে পাবেন হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম নিশ্চিন্তে আঁকড়ে থাকবেন। মুসলমানরাও ওইভাবে নিজেদের অধিকার বজায় রাখবেন। ধর্মীয় ভাবে নয়, প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস রক্ষার তাগিদে আর এক রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে রাজনৈতিক বিশ্বাসে।’’

জিন্নার এই ভাষণ কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে? জিন্না বলতে চেয়েছেন প্রধানত নাগরিকদের ধর্মবিশ্বাসের কথা। জিন্না ইন্সটিটিউট-এ অধ্যাপক এ এইচ নায়ার জাতীয় পাঠক্রম নিয়ে পাঠ সমীক্ষা চালান। প্রথম শ্রেণী

ইসলামাবাদে অস্থায়ী স্কুল।

থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ২০০৬ সালের পাঠক্রমের ২৭টি উর্দু পাঠ্যবই ও ৩০টি ইংরেজি বইয়ে জিন্নার বক্তৃতা ‘বিশ্বাসের স্বাধীনতা’ নিয়ে সমীক্ষা নেন। দেখা যায় বেশ কিছু স্কুলপাঠ্য বইয়ে জিন্নার সেই বক্তৃতা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়নি। উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিকৃতি ঘটেছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার বক্তৃতার। অধ্যাপক এ এইচ নায়ার যে গবেষণাপত্রটি তৈরি করেছেন তার শিরোনাম : ‘এ মিসড অপারচুনেটি : কনটিনিউইং ফ্লোজ ইন দি নিউ কারিলাম অ্যান্ড টেকস্ট বুকস আফটার রিফর্মস।’ এর বাংলা ভাষায় রূপান্তর এইরকম : একটি হারানো সুযোগ : সংস্কারের পর নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যবইয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার পুনরাবৃত্তি।’

পাঠ্য বইয়ের লেখকরা কয়েদ-ই-আজম জিন্নার বক্তৃতাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। নবগঠিত রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুরা ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা পাবেন সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতোই— জিন্নার এই উক্তি সমর্থন করা হয়নি। বলা হয়েছে রাষ্ট্রে যা খুশি ঘটুক জিন্না তেমন চাননি কখনও।

জাতীয় পাঠক্রমে আরও যোগ হয়েছে পাকিস্তানের বিদেশনীতিতে আদর্শবাদের কথা— যা মোটেই নেই। যেমন পাকিস্তানের দশম শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠক্রমে বলা হয়েছে— ‘পাকিস্তানে আদর্শ ও বিদেশনীতি একসঙ্গে মিশেছে। পাকিস্তান একটি নীতিবাদী রাষ্ট্র যার ভিত্তি ইসলামি আদর্শ।’ লেখকরা বাছাই করেছেন ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে। ১৯৭১ সালের ঘটনার ব্যাখ্যা করেছেন নিজের মতো। অধ্যাপক নায়ার বলেছেন, ‘আমাদের পাঠ্যবইয়ে পুরোপুরি দায়ী করা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের। একবারও বলা হয়নি পাকিস্তানের ফৌজ আর তাদের সহযোগীরা কীভাবে যথেচ্ছাচার চালিয়েছে’।

২০০৬ সালের নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী লেখা পাঠ্যবই ২০১২ সাল থেকে জোর করে চালু হয়েছে। মাঝখানে অনেকরকম কারণে দেরি হয়েছে, তিনবার এনিয়ে বেশ আলোড়নও হয়েছে। অধ্যাপক নায়ার বলেছেন, প্রথমত, দেশের অ-মুসলমান নাগরিকদের যে নিরাপত্তা পাওয়ার সংবিধান স্বীকৃত অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে রাষ্ট্রের আদর্শগত ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল যার মধ্যে ইতিহাস জড়িত। তৃতীয়ত, শিক্ষার উপকরণেও বিভ্রান্তি যথেষ্ট। এর ফলে শিক্ষা হয়ে উঠেছে ব্যাপকভাবে সমস্যাযুক্ত। আর প্রথম ধাপ থেকেই অমুসলমানদের বলা হচ্ছে, এই দেশ তোমাদের নয়।

(সূত্র : জনসঙ্ঘ টু ডে)

সংবাদ প্রতিবেদন

আশায় বিজেপি, শঙ্কায় কংগ্রেস

যুব-ভারত-ই এবারের নির্বাচনে দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন॥ আজকের ছাত্র আগামীদিনের নয়, আজকেরই নাগরিক— এমন তত্ত্ব জাতীয়তাবাদী ঘরানার ছাত্রমহলে বহুদিন ধরেই চালু। কিন্তু এর সম্যক রূপটি সম্ভবত এই প্রথম ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে প্রদর্শিত হতে চলেছে। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত সাম্প্রতিকতম তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রথমবারের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে অন্তত ৯০ হাজার ভোটার থাকছেন, যাঁদের বয়স ১৮ থেকে ২২-এর মধ্যে। অর্থাৎ এঁরা প্রত্যেকেই এবার প্রথম দেশের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় (পড়ুন লোকসভায়) অংশ নেবার সুযোগ পাচ্ছেন। যুব-ভারতের এই নতুন নির্বাচকমণ্ডলী-ই আপাতত কংগ্রেস-নেতৃত্বের সবচেয়ে মাথাব্যথার কারণ। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে আরও যা জানা যাচ্ছে তা হলো, প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে গড়ে অন্তত ১ লক্ষ ৭৯ হাজার নতুন ভোটার রয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ২৪ শতাংশ অর্থাৎ ৪৩ হাজার ভোটার জীবনে প্রথমবার কোনও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন— এই পরিসংখ্যানটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ২০০৯-এর নির্বাচন ২২৬টি লোকসভা কেন্দ্রে এর চেয়ে কম ভোটের ব্যবধানে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছিল। রাজনৈতিক মহল মনে করছেন, এই মুহূর্তে দেশের যুবকদের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর যা জনপ্রিয়তা তার সবটা ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হলে কংগ্রেসের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেওয়াও বিচিত্র নয়।

নির্বাচন কমিশন যে পরিমার্জিত নির্বাচনী ভূমিকা-র পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে এই বছরের ১ জানুয়ারি, তাতে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্র পিছু গড়ে ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সী ৪২ হাজারেরও বেশি ভোটার তাঁদের নাম নথিভুক্তি করিয়েছেন। কংগ্রেসের পক্ষে গভীর উদ্বেগের কারণ দেশের ছ'টি রাজ্যে যাদের মোট লোকসভা আসন সংখ্যা দু'শোরও বেশি যেখানে ১৮ থেকে উনিশ বছর বয়সী ভোটারের সংখ্যা জাতীয় গড়ের থেকে বেশ বেশি। এর মধ্যে পাঁচটি রাজ্যে কংগ্রেসের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে তিনটি রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি, বাকির মধ্যে অন্তত দু'টিতে নির্বাচনী সমীক্ষা খুব ভালো ফলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। রাজ্যগুলি হলো রাজস্থান (আসন সংখ্যা ২৫), ছত্তিশগড় (১১), মধ্যপ্রদেশ (২৯), পশ্চিমবঙ্গ (৪২), উত্তরপ্রদেশ (৮০) এবং অসম (১৪)। (তথ্য-সারণী দ্রষ্টব্য)।

তথ্য-সারণী

বয়সের কড়চা

প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্র অনুযায়ী ১৮-১৯ বছর বয়সী ভোটারের সংখ্যা যে রাজ্যগুলিতে সর্বভারতীয় গড়ের চেয়ে বেশি।

রাজস্থান	৮১,৬৫০
ছত্তিশগড়	৭৮,৮২৭
মধ্যপ্রদেশ	৫৪,৯৪৮
পশ্চিমবঙ্গ	৪৯,৫১৭
উত্তরপ্রদেশ	৪৭,৬৭৭
অসম	৪৬,৯৪২
সর্বভারতীয় গড়	৪২,৬৫৪

২০১৪-য় মোট ভোটদাতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮১.৫ কোটিতে। ২০০৯-এ এই সংখ্যাটাই ছিল ৭১.৭ কোটি। অর্থাৎ বিগত পাঁচ বছরে ভোটদাতার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় দশ কোটি। সবমিলিয়ে ১৩.৬ শতাংশ। এর মধ্যে ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সী ভোটারের সংখ্যা ২.৩২ কোটি। সামগ্রিক হিসেবে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ২৪ শতাংশ। আবার ভোটারদের বয়স ১৮ থেকে ২৩ হলে তার সংখ্যা গিয়ে ঠেকবে ৪.৮৭ কোটিতে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন এই নতুন ভোটারদের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত অরাজনৈতিক। এক্ষেত্রে মোদীর 'দেশের জন্য ভোটদান'-এর স্লোগান এঁদের আকর্ষণ করতে বাধ্য। উপরন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভোটও সামিল হচ্ছে। দলের যুব-সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক পি মুরলীধর রাও জানিয়েছেন দেশের যুবকদের সঙ্গে সংযোগে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি নেতৃত্ব বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছে। তাই দেশের বুকে 'আঠেরো নেমে আসা'র আশায় দিন গুনছে বিজেপি আর কংগ্রেস- নেতৃত্ব 'আঠেরো বছর বয়স কী ভয়ংকর' সেই চিন্তাতেই কৌশল রচনায় ব্যস্ত।

বিশ্বজুড়ে আশঙ্কাজনকভাবে সন্ত্রাসবাদী হামলা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন॥ বিশ্ব জুড়ে ২০১৩ সালে সন্ত্রাসবাদী হামলা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। ২০০৯ সালে সারা বিশ্বে যেখানে সন্ত্রাসবাদী হামলার সংখ্যা ছিল ৭২১৭, সেখানে ২০১৩-তে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার ৫২৪। অর্থাৎ ১৫০ শতাংশ বেড়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক তথ্য ও মতামত সরবরাহকারী সংস্থা হিসেবে পরিচিত আই এইচ এসের 'আই এইচ এস জেনস ২০১৩ গ্লোবাল টেররিজম অ্যান্ড ইমারজেন্সি অ্যাটাক ইনডেক্স'-এর প্রকাশিত তালিকায় এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

আঞ্চলিক দলগুলি রাজ্যের ক্ষুদ্র স্বার্থে কাজ করে, তাই শুধু জাতীয় দলকেই ভোট দিন

গূঢ়পুরুষের কলম

আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে প্রচার চালাতে প্রার্থী পিছু খরচের হার ৭০ লক্ষ টাকা করেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। আর এতেই রেগে টং মমতা দিদি। বলেছেন, খুব খারাপ সিদ্ধান্ত। তৃণমূলের মতো ছোট ছোট আঞ্চলিক দলের পক্ষে এত টাকা কীভাবে জোগাড় করা যাবে। রাজ্যের ৪২টি লোকসভার আসনে প্রার্থী দিলে তৃণমূলের প্রায় ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা লাগবে। মমতার মতে আঞ্চলিক দলের উপর একটা অবাস্তব আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের অন্য আঞ্চলিক দলের কথা জানি না। তবে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে প্রায় ৩০ কোটি টাকা দলীয় কর্মীদের প্রচারকালে দেয় সামান্য জলপানের খরচ। দিদির আঁকা একটা ছবিই কলকাতার স্তাবক শিল্পপতিরাই কম সে কম ছয় কোটি টাকায় কিনে নেবে। দিদি নির্বাচনের মওকায় যদি এক ডজন ছবি এঁকে ফেলেন তবে একটা নয়, দু' দুটো নির্বাচনের খরচ উঠে আসবে।

ছবি বেচে শিল্পপতিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনই নেই দিদির। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সবচেয়ে পয়সাওয়ালা পার্টি। দিদির একদা আশীর্বাদধন্য চিটফান্ড সারদা গোষ্ঠীর মালিক সুদীপ্ত সেন পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম থেকে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা প্রতারণার মাধ্যমে গরিব মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছিলেন। সেই টাকাটার আর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সারদার এই বিপুল অর্থ খুঁজে বার করতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইকে দায়িত্ব দিতে চেয়েছে। কিন্তু দিদি মোটেই রাজি নন। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের পুলিশ তদন্ত করছে। এখন সিবিআইকে তদন্তের দায়িত্ব দিলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মনোবল ভেঙে যাবে। কী অদ্ভুত যুক্তি। সারদার প্রতারণার মামলায় রাজ্য পুলিশ আজও ১০৫টি মামলায় আদালতে চার্জশিট দিতে পারেনি। সারদার হাতিয়ে নেওয়া ৩০ হাজার কোটি টাকার একটা টাকার সন্ধান দিদির রাজ্য পুলিশ পায়নি। এমন অপদার্থ তদন্তকারী পুলিশের মনোবল ভেঙে যাবে বলে সিবিআই তদন্ত দিদি করতে দেবেন না। কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ই ডি) আলাদাভাবে তদন্ত শুরু করেছিল। কিন্তু রাজ্য পুলিশ তদন্তের কাজ ভেস্তে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তৃণমূল সরকার কেন সারদার বিপুল অর্থের খোঁজে আগ্রহী নয়। মনে হয়, 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'। লোকসভার নির্বাচনে তৃণমূলের প্রচার খরচের বহর দেখলে ব্যাপারটা অবশ্যই বোঝা যাবে। শুধুমাত্র রাজ্যের ৪২টি আসনেই নয়, তৃণমূল কংগ্রেস সারা উত্তর ভারত ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবার প্রার্থী দিচ্ছে। দলের প্রার্থীদের প্রচার খরচ পাঁচ-সাত হাজার কোটি টাকা ছাড়ালে অবাক হবেন না। সমস্ত রাজনৈতিক দলই জানে যে নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া প্রচার খরচের থেকে বাস্তবে প্রার্থীদের খরচ হয় প্রায় দশ গুণ। তাছাড়া প্রতিটি লোকসভার আসনে একাধিক প্রার্থী থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে এবার তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস আলাদা আলাদাভাবে লড়বে। এই তিন প্রধানের বাইরেও একাধিক নির্দল প্রার্থী থাকবেন। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসন জেতার বিস্তর নজির আছে। কিন্তু লোকসভা আসনে এমনটি হয় না। ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া যায় না। সব রাজনৈতিক দলই সাধ্যের বাইরে গিয়ে প্রচার খরচ করে। ভয় দেখিয়ে প্রার্থী প্রত্যাহার করানো যায় না।

লোকসভার নির্বাচনের প্রচার খরচের বড় অংশ মিডিয়া মালিক এবং বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিচালকদের পকেটে ঢোকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা চাইবে এবার লোকসভার নির্বাচনের ফলাফল ত্রিশঙ্কু হোক। সেক্ষেত্রে আবার নির্বাচন হবে। এই কারণেই মিডিয়ার সমস্ত জনমত সমীক্ষায় বলা হয়েছে ত্রিশঙ্কু লোকসভা হবে। মনে রাখতে হবে দেশের সাধারণ নির্বাচনে আনুমানিক খরচ হয় দশ হাজার কোটি টাকা। এই টাকা আসে কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগার থেকে এবং শিল্পপতিদের কাছ থেকে গোপন চাঁদা হিসাবে। শিল্পপতিরা অবশ্য রাজনৈতিক দলকে দেওয়া চাঁদাকে বিনিয়োগ বলে মনে করেন। নির্বাচনের পর চাঁদা বাবদ দেওয়া অর্থের চারগুণ টাকা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে বাজার থেকে শিল্পপতিরা তুলে নেন। ক্ষমতাসীন বা বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দলই নির্বাচন পরবর্তী অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করে না। কারণ, প্রচার খরচের চাঁদাটা সকলেই কমবেশি পেয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে যে টাকাটা নির্বাচন কমিশন মারফত খরচ করা হয় তাও নির্বাচনের পর ক্ষমতায় আসা সরকার বিভিন্ন ধরনের কর বসিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। তাই সাধারণ মানুষের কাছে আমার আবেদন, যদি বাঁচতে চান তবে এবার চূড়ান্ত নির্ণায়ক ভোট দিন। আঞ্চলিক দলের প্রার্থীদের মোটেই ভোট দেবেন না। কারণ, এটি লোকসভার নির্বাচন, বিধানসভার নয়। দেশের আঞ্চলিক দলগুলি তাদের রাজ্যের ক্ষুদ্র স্বার্থে কাজ করে। এদের পক্ষে জোটবদ্ধ হওয়াটা সম্ভব নয়। মমতা, মায়াবতী, জয়ললিতা একযোগে দেশের মানুষের সার্বিক স্বার্থে কাজ করছেন এমনটা ভাবা আর যাইহোক বাস্তবসম্মত নয়। এই পরিস্থিতিতে তখন আবার নির্বাচন ছাড়া দ্বিতীয় পথ খোলা থাকবে না। শুধুমাত্র জাতীয় দলকেই ভোট দিন। ভারতে মাত্র দু'টি জাতীয় দল আছে। বিজেপি এবং কংগ্রেস। শাসক দল হিসাবে দীর্ঘ ৬০ বছর কংগ্রেসের চেহারাটা দেখেছেন। দুর্নীতি আর অপশাসন ছাড়া আর কিছুই কংগ্রেস দেশবাসীকে দেয়নি। তাই বিজেপি-কে কমপক্ষে ২৮০টি আসনে জয়ী করুন। তবেই দেশ বাঁচবে, আপনি বাঁচবেন। অন্যথা, সর্বনাশের পথে দেশকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা সবাই সমান দোষী হবো, ইতিহাস ভারতের সাধারণ মানুষকেই অপরাধী বলবে।

আলিমুদ্দিনের কালবেলা, বুদ্ধবাবুর দুঃসময়

মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী,
৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট

একা রেজ্জাকে রক্ষা নেই লক্ষ্মণ দোসর। আপনার কাছে সত্যিই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দলের ভিতরে থেকে দুই প্রথম সারির নেতার যৌথ আক্রমণ যে কতটা গায়ে জ্বালা ধরাতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পেল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। দলের বিরুদ্ধে তির ছুঁড়তে অনেকদিন ধরেই ধনুক বাগিয়ে রেখেছেন আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা। এবার সেই ধনুকের ছিলায় নিজের তির গেঁথে নিলেন লক্ষ্মণ শেঠ।

রেজ্জাক মোল্লা যে ফোঁস করেন, মাঝে মাঝে ছোবল দেন সে ব্যাপারে অনেক দিন আগেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে সিপিএম। অভ্যস্ত হয়ে গেছেন আপনিও। কিন্তু স্নেহভাজন লক্ষ্মণ শেঠের থেকে এমন চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ কি সত্যিই ভাবতে পেরেছেন বুদ্ধদেব বাবু?

লক্ষ্মণ শেঠ আপনার নাম নেননি। কিন্তু আপনার এককালের ঘনিষ্ঠ নেতা লক্ষ্মণ শেঠ আপনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে তুলনা করলেন সেক্সপিয়রের কিং লিয়রের সঙ্গে। দলের বাকি নেতাদেরও ছেড়ে কথা বললেন না। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশনই এক বড় শৃঙ্খলাভঙ্গ বলে দাবি করে লক্ষ্মণ বললেন, দলের মাথাদের শুদ্ধিকরণ চাই আগে। এমনকী কিং লিয়রের মতো আপনিও ধ্বংস হয়ে যাবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন।

একেই বলে সময়। একেই বলে পরিবর্তন। সেটা ছিল এক রবিবার। এক মঞ্চে রেজ্জাক-লক্ষ্মণ। সিপিএমের পূর্ব-মেদিনীপুরের সম্পদ এবং দক্ষিণ ২৪-পরগণার সম্পদ। দু'জনেই সামাজিক ন্যায় বিচার মঞ্চে। কদিন আগেও দক্ষিণ ২৪-পরগণার আব্দুর রেজ্জাক মোল্লার সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের লক্ষ্মণ শেঠের সম্পর্ক খুব একটা মধুর ছিল না। এক দলের প্রতিনিধি হলেও অনেক ফারাক ছিল দুই নেতার। নিজেকে 'চাষার ব্যাটা' বলা রেজ্জাক মোল্লা বরাবর দলের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সমালোচনার চোখে দেখে এসেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সব থেকে বেশি রাগ প্রকাশ পেয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আপনার বিরুদ্ধে। কদিন আগেই আপনার স্নেহভাজন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যসভায় প্রার্থী হওয়ায় প্রকাশ্যে দল-বিরোধী প্রচারে নামেন। সেই হিসেবে লক্ষ্মণ শেঠও বরাবরই আপনার স্নেহভাজনদের তালিকায় ছিলেন। এখন অবশ্য আর সেই সম্পর্ক নেই। নন্দীগ্রাম কাণ্ডের পরও বুদ্ধদেব-লক্ষ্মণ সুসম্পর্ক অটুট ছিল। আর তখনই লক্ষ্মণ শেঠের বিরুদ্ধে কথা বলে পার্টির ভর্ৎসনার মুখে পড়েন রেজ্জাক মোল্লা। এখন অবস্থার বদলে লক্ষ্মণ তাঁর শিবিরে। লক্ষ্মণ ইস্যুতে তখন তবে কে ঠিক ছিল? পার্টি, না রেজ্জাক মোল্লা? সেই প্রশ্নও তুলেছেন রেজ্জাক মোল্লা।

অবশেষে বহিষ্কৃত রেজ্জাক মোল্লা। দল বিরোধী কাজের জন্য শেষ পর্যন্ত লোকসভা ভোটের মুখে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ককে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনারা। অনেকদিনই দল এবং নেতাদের বিশেষ করে আপনাকে নানা ভাবে প্রকাশ্যে অপমান করেছেন রেজ্জাক সাহেব। তবু চুপ থেকেছেন। কিন্তু যেই পাল্টা দল গড়ে সিপিএমকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন অমনি বহিষ্কৃত ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক। তাঁর এখনকার 'সামাজিক ন্যায় বিচার মঞ্চ' আগামী বিধানসভা নির্বাচনেই দল হয়ে ভোটের ময়দানে নামবে বলে ঘোষণা করেন রেজ্জাক। দলের ওপর ক্ষুব্ধ তমলুকের প্রাক্তন সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠকে পাশে নিয়ে দল ভাঙার খেলাও শুরু করে দেন। একই সঙ্গে হুমকি দিয়ে বলেন, পার্টি পারলে বহিষ্কার করে দেখাক। যাক, অনেকদিন অপেক্ষা করার পর সিপিএম এদিন সেই সাহস দেখাল।

কিন্তু তাতেও নিস্তার মেলেনি। লোকসভা ভোটের আগে আপনাদের হাঁড়ি হাটে ভাঙার জন্য তৈরি রেজ্জাক পার্টির বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত জানার পর 'মোস্ট ওয়েলকাম' বলে স্বাগত জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে নাম না করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসুদের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলছেন, পার্টির প্রতি তাঁর আনুগত্য কমেনি, যাবতীয় ক্ষোভ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। ক্ষোভ তাদের বিরুদ্ধে যারা পার্টিকে কুক্ষিগত করে রেখেছে। তাঁর কথায়— নেতৃত্বের প্রাণ নেই, সবাই পাথর হয়ে গেছেন। একদিকে যেমন রাজ্য নেতৃত্বকে জগদ্দল পাথর বলে কটাক্ষ করেছেন তেমনই দিল্লীতে তৃতীয় ফ্রন্ট প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে পীর বলে সমালোচনা করেছেন রেজ্জাক। বলেছেন, দল চালাচ্ছে ম্যানেজাররা। আর কর্মচারী সমালোচনা করলে তাঁকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। পার্টিতে লিডার-ক্যাডার ব্যাপারটাই নেই। সবই ম্যানেজার কর্মচারী সম্পর্ক। আর আপনার ভুল স্বীকারের গুণকে উনি বলেছেন, থুতু ফেলে থুতু চাটা। সত্যি বলছি বুদ্ধবাবু, কোনও বিরোধীদলের নেতাও আপনাকে এভাবে 'থুতু চাটা নেতা' বলার অসৌজন্য দেখায়নি।

আপনি একসময় 'দুঃসময়' নামে নাটক লিখেছিলেন। এখন ঘরে বসে 'আবার দুঃসময়' নামে নাটক লিখে ফেলুন।

— **সুন্দর মৌলিক**

এ গণতন্ত্র সে গণতন্ত্র নয়!

মৃগাঙ্ককৃষ্ণ রায়

ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র— ভারতের সংবিধানই এর ভিত্তি। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক অধিকার সবার সমান। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে দরিদ্রতম নাগরিকের 'অধিকার' আইনের চোখে সমান। প্রত্যেকটি নাগরিক ন্যায়-বিচার পাবে। ধনী এবং গরিব সংবিধানের দৃষ্টিতে সমান। সবার বেঁচে থাকার অধিকার আছে, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার আছে, নিজের মত প্রকাশ করার অধিকার আছে, জীবন রক্ষার অধিকার আছে, কেউ কখনই কোনোভাবে অন্যের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। এছাড়াও ভোটে দাঁড়াবার, ভোট দেবার, প্রতিনিধি নির্বাচন করবার অধিকারও একজন নাগরিকের আছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতবাসী গণতন্ত্রের ছায়াতলে বসবাস করছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত নাগরিক ভোটে দাঁড়াতে পারে, এমনকী অশিক্ষিত অশীতিপর বৃদ্ধ/বৃদ্ধা ভোটে দাঁড়াতে পারে এবং সরকারের দায়িত্বে আসতে পারে; অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য বয়সের কোনো সীমারেখা নেই। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কাজের উর্ধ্বসীমা ষাট। কারণ, ষাট বছরের পর মানুষ মানসিক ও দৈহিক কর্মক্ষমতা হারাতে থাকে। সেইজন্য তাকে দায়িত্বশীল পদে রাখা যায় না। এতে দেশের ক্ষতি। গণতান্ত্রিক অধিকার সংবিধান নির্ভর। সংবিধানের 'প্রস্তাবনা'টি ভাষার সৌন্দর্যে ভরপুর, যেন বিচিত্র ফুলে গাঁথা একটি মালা। বাস্তবটি ভাষার মধ্যে চাপা পড়ে গেছে।

যারা বলে ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র— তাদের সঙ্গে আমি সহমত নই। আমি বাস্তবাদী। এদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অন্ধ। সব রাজনৈতিক দল একই কথা বলে থাকে। এতে মিথ্যাটি তাদের কাছে 'সত্য' আকার ধারণ করেছে। বাস্তব দিকটি তাদের কাছে উপেক্ষিত। আমি দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি :

এক : ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয় কিংবা গণতান্ত্রিক অধিকার বৈষম্যে ভরা।

দুই : সংবিধানে বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা উপেক্ষিত তাই অশিক্ষিত মানুষদের শাসন।

আমি প্রথম বিষয়টি— 'ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়, কিংবা, গণতান্ত্রিক অধিকার বৈষম্যে ভরা' নিয়ে আলোচনা করছি। আমি বিস্মিত, কেননা, শিক্ষিত সমাজ এই বিষয়টি বোঝেন না, রাজনৈতিক দল তাঁদের যা বোঝায় তাই বোঝেন। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, দেশ জুড়ে যত সংবাদপত্র বা পত্র-পত্রিকা আছে— সেগুলি আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব। যে পশ্চিমবঙ্গ গোটাদেশের পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিত ছিল সেই পশ্চিমবঙ্গ— বিশেষত কলকাতা প্রতিবাদী হওয়া তো দূরের কথা— মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না। এখন কলকাতা এবং সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দুষ্কৃতীদের রাজত্ব। এখানে চলছে নারী নির্যাতন। গৃহবাসীরা আতঙ্কে জীবন-যাপন করে। লেখাপড়া শিকেয়। এটা কী গণতান্ত্রিক রূপ?

যুক্তি এবং কয়েকটি মাত্র উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করছি ভারত গণতান্ত্রিক দেশ নয় এবং গণতান্ত্রিক অধিকার বৈষম্যে ভরা, অর্থাৎ সবার গণতান্ত্রিক অধিকার সমান নয়। দেশে আছে পার্লামেন্ট বা সংসদ। পার্লামেন্ট বা সংসদ ভবন-এ দু'টি কক্ষ। একটির নাম লোকসভা, দ্বিতীয়টির নাম রাজ্যসভা। দু'টি কক্ষের সদস্যদের সাংসদ বা এমপি (Member of Parliament) বলা হয়। লোকসভার সদস্য সংখ্যা পাঁচশো চুয়াল্লিশ। রাজ্য সভার সদস্য সংখ্যা লোকসভার সদস্যসংখ্যা থেকে কম। দু'টি কক্ষের সদস্যই রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করে। ভোগ করে রাজকীয়ভাবে। অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এদের হাতের মুঠোয়।

দেশের যত রাজ্য আছে সেইসব রাজ্য থেকে লোকসভার সদস্য বা সাংসদ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের ভোটদাতারা ভোটদানের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে। এ পদ্ধতি অবশ্যই গণতান্ত্রিক।

লোকসভার নির্বাচন গণতান্ত্রিক নিয়মের ভেতর দিয়ে, দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ভোট প্রদানের মাধ্যমে লোকসভার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এখানে নাগরিকরা নিজেদের পছন্দ অনুসারে, প্রত্যক্ষভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে— এ পর্যন্ত ঠিক। কিন্তু রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচনে জনগণের কোনো ভূমিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নেই। রাজ্যসভার সাংসদ বা এমপি খিড়কির দরজা দিয়ে ঢোকানো হয়। এটা কোনো নির্বাচন নয়। নাগরিকরা জানতেই পারে না। এটা সম্পূর্ণ অ-গণতান্ত্রিক এবং অবৈধ।

এইভাবে পিছনের দরজা দিয়ে সদস্য ঢোকানোতে ছোটো-বড়ো সবকটা রাজনৈতিক দলের পূর্ণ সমর্থন আছে। তারা কখনই জনপ্রতিনিধি নয়, অথচ, কে বা কারা এমপি বা সাংসদ হয়ে গেল। এটা কী গণতন্ত্র? একটি উদাহরণ ভেতর দিয়ে বিষয়টিকে সহজভাবে সাধারণ মানুষদের বোঝানো দরকার। ধরা যাক, রামবাবু লোকসভার এমপি হবার জন্য ভোটে দাঁড়ালেন। ভোটদাতারা তাঁকে ভোট দিলেন না। জনগণের তাঁকে পছন্দ নয়। লোকসভার নির্বাচনে রামবাবু চরমভাবে পরাজিত হলেন। কীমাশ্চর্যম্! কোনো রাজনৈতিক দল রামবাবুকে খিড়কির দরজা দিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ বা এমপি করলো। তিনি অর্থমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীও হয়ে গেলেন। এটা কী গণতন্ত্র? এর পরেও কী বলা হবে, ভারত গণতান্ত্রিক দেশ?

অনেকেই হয়তো জানেনা যে, অনেক রাজ্যে এখনো বিধানসভার পাশাপাশি বিধান পরিষদ আছে। ব্যাপারটা লোকসভা ও রাজ্যসভার মতো। স্বাধীনতার পর প্রায় সব রাজ্যেই 'বিধানসভা' এবং 'বিধানপরিষদ' ছিল। বিধানসভার সদস্যরা লোকসভার

সদস্যদের মতো নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু 'বিধানপরিষদ'- এর সদস্যরা রাজ্যসভার সদস্যদের মতো পিছনের দরজা দিয়ে সদস্য করানো হয়। বিষয়টি জনগণকে জানতে বা বুঝতে দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে জনগণের কোনো ভূমিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ— কোনোভাবেই নেই। উদাহরণ স্বরূপ : বিহার। বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের সদস্যকে বলা হয় বিধায়ক। বিধান সভার সদস্যদের ইংরেজিতে এম.এল.এ বলা হয় এবং বিধান পরিষদের সদস্যদের এম.এল.সি. বলা হয়। এখানেও বিধান পরিষদের সদস্য মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রী হতে পারেন। জনগণ একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ। এটা কী গণতন্ত্র?

আরো একটি বড়ো এবং গুরুগম্ভীর উদাহরণ দিচ্ছি। রাষ্ট্র-নায়করা অতি অবশ্য বিষয়টি নিয়ে ভাববেন এবং মতামত প্রকাশ করবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যে পদ্ধতি আছে সেটি সম্পূর্ণ অ-গণতান্ত্রিক। যে রাজনৈতিক দলটি (এক বা অন্য রাজনৈতিক দলের সমষ্টিও হতে পারে) শাসকদলের ভূমিকায় আছে সেই দলটি তাদের পছন্দসই যে কোনো এক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি করে। স্বাধীনতার পর থেকে এই বাহুবলের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে আসছেন। এখানে জনগণের বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই। এর পরেও কি বলা হবে ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র? তবে একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি অনেক পরিশ্রম করে 'বিধান পরিষদ'কে বাতিল করেছিলেন। কারণ, তাঁর কাছে মনে হয়েছে এর মধ্যে গণতন্ত্র নেই। অতীব লজ্জার কথা, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী 'বিধান পরিষদ'-কে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছেন।

রাজনৈতিক দলগুলি বলেই চলেছে যে, গণতান্ত্রিক অধিকার সবার সমান। ডাহা মিথ্যা। লেখাপড়া না জানা, সহজ-সরল মানুষদের তারা ঠকাচ্ছে। গরিব মানুষদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই। তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বড় অন্তরায় রাজনৈতিক দলগুলি। এটা কোনো তর্কের বিষয় নয়, এটা বাস্তব। মনে রাখা চাই, তর্ক-বিতর্ক করে সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না, তবে আলোচনার পথে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। নেতা-নেত্রীরা যে সুযোগ সুবিধা পায় সাধারণ মানুষ পায় না। অর্থনৈতিক অধিকার না থাকার জন্য তারা অত্যাচারিত, নিপীড়িত এবং আদালতে বিচারের জন্য যেতে পারে না। এমনকী সরকারি প্রশাসন তাদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার করেই চলেছে। নারী নির্যাতন এই দেশে এবং এই রাজ্যে প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। প্রশাসন নির্বিকার। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা বড় বেশি ভোগী, লোভী। তারা 'গণতন্ত্র' নামক শব্দটির মুখোশ পরে আছে। ছোট্টো একটি উদাহরণ--- ঔরঙ্গজেব একসময় মোগল সাম্রাজ্যের দিল্লীর তথা ভারতের সম্রাট ছিল। অতি সাদাসিধে জীবন-যাপন করতো। টুপি সেলাই করতো। সেসব বাজারে বিক্রি হোত। তাই দিয়ে তার নিজের পেট চলতো। সবাই হয়তো জানে না যে, ঔরঙ্গজেবের সময়ে তার হারেমখানা ছিল সবচেয়ে বড়--- পৃথিবীর বৃহত্তম হারেমখানা। আড়াইশো-র ওপর যুবতি নারীদের রাখা হয়েছিল। কাদের জন্য প্রত্যেকদিন পোশাক তৈরি হয়ে আসতো। মোগল যুগে একটি পোশাকের জন্য কমবেশি পাঁচ হাজার আসরফি পড়তো।

আমি এখন দ্বিতীয় বিষয়টি --- 'সংবিধানে বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা উপেক্ষিত'— নিয়ে আলোচনা করবো। জনপ্রতিনিধি বা বিধায়ক বা সাংসদ হওয়ার জন্য বয়সের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। শিক্ষাগত যোগ্যতারও কোনো প্রয়োজন নেই। বিষয়টি লজ্জাকর এবং হাসির, সর্বোপরি অপমানজনক। যারা প্রশাসনের শীর্ষস্থানে রয়েছে (আই এ এস), যাদের আমলা বলা হয় তাদের মাথার ওপর অশিক্ষিত মন্ত্রিবর্গ থাকাটা অপমানজনক। আমাদের দেশে দেখা যায় যে, যারা বয়সের ভারে ন্যুব্জ-কুব্জ, যবুথবু তাঁরাই রাজনৈতিক সরকারের দায়িত্বে আছেন। যাঁদের রাজনৈতিক দায়িত্বে আসার কথা, অর্থাৎ সূর্যশক্তির বাহক যুবা সম্প্রদায় তাঁরা বুড়ো-বুড়িদের ক্ষমতায় বসানোর জন্য আন্দোলন করে শহীদ হন। কী ভয়ঙ্কর তামাশা! কী ভয়ঙ্কর লজ্জা!

তথাকথিত ভারতের গণতন্ত্রে প্রথম অন্তরায় বয়স— বুড়ো- বুড়িদের অবস্থান। এদের দৈহিক ক্ষমতা নেই। মানসিক ক্ষমতা নেই। স্মৃতিশক্তি দুর্বল। উদ্ভাবনী ক্ষমতার অভাব। উর্বর মস্তিষ্ক বা মেধার অভাব। অভাব দৃঢ় মানসিকতার। অভাব পরিকল্পনা গ্রহণের। অভাব পরিকল্পনা তৈরির ক্ষমতার। অভাব পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার। অভাব আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির। অভাব সর্বজনীন মানসিকতার। অভাব মানবিকতার ইত্যাদি।

এইসব ছাড়াও আরো অনেক সমস্যা আছে। দ্বিতীয় অন্তরায়— শিক্ষা। যারা রাজনীতিক তারা বেশিরভাগ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। শিক্ষার সম্যক জ্ঞানও এদের নেই। লেখাপড়া না জানার জন্য ব্যক্তিত্বও নেই। এদেশে, বিশেষত রাজনীতির ক্ষেত্রে, একজন রাজনীতিককে অতি অবশ্য তিনটি ভাষা জানতেই হবে। না জানলে সে হবে একটি কাঠ পুতুল। ভাষা তিনটি— এক, হিন্দী, দুই, আঞ্চলিক বা মাতৃভাষা, এবং তিন, ইংরেজি। এই ত্রয়ী ভাষা না জানা থাকলে ভারতের রাজনৈতিক জগতে তার বা তাদের স্থান নেই। আমি সাধারণ নাগরিকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের দেশের সিংহভাগ রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীরা তিনটি ভাষা তো দূরের কথা, একটি ভাষা-ই ভালো করে লিখতে বা বলতে পারেন না। তৃতীয় অন্তরায়— আদর্শহীনতা। সিংহভাগ রাজনীতিক অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ এবং মিথ্যাচারী। লোভ আর ভোগ— এদের জীবন সঙ্গী।

শিক্ষিত যুবসমাজ রাজনীতির পতাকার বাহক না হলে জাতীয় পতাকার মর্যাদা হানি হবে এবং দেশের পরিবর্তন সম্ভব নয়। যেদিন যুব-সমাজ মানবিক ধর্মে দীক্ষিত হয়ে, মিথ্যাচারকে আগুনে পুড়িয়ে সত্যের পথে কাজ করবে সেদিনই পরিবর্তন সম্ভব, অন্যথায় দেশ অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

শ্রীচৈতন্যের সাম্যবাদ

অসিত বরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রচলিত রাজনৈতিক মতাদর্শগুলির মধ্যে একটি মতবাদের নাম সাম্যবাদ। এই সাম্যবাদ যে ভাবে ব্যাখ্যাত হয় শ্রীচৈতন্য সে ধরনের সাম্যবাদী ছিলেন না। রাজনৈতিক প্রচারের কল্যাণে সাম্যবাদ বলতে প্রায় সবাই একথাই বলে থাকেন। তবুও শ্রীচৈতন্যকে সাম্যবাদী আখ্যা দিতে হলে একটু দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন আছে। সম বা সমান থেকে যদি সাম্যবাদ শব্দের উৎপত্তি হয়, তা হলে প্রশ্ন আসে কিসের সঙ্গে কিসের সমান। অবশ্যই মানুষের সঙ্গে মানুষের। জগতে মানুষই সমাজ গড়েছে। মানুষ মানুষের জন্যই শিক্ষা, ধর্ম, কর্ম বিভাগ করেছে। মানুষের গুণগত বৈষম্যের ফলে এক শ্রেণীর মানুষ অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষকে হীন চোখে দেখে। ক্রমে এই হীনতা ক্ষোভের কারণ হয়। সমাজের এই বিশৃঙ্খলা দূর করতে এক একজন মহামানবের আবির্ভাব ঘটে। ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখব, গৌতমবুদ্ধ এই কাজই করেছেন, পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য এই কাজ করে গেছেন।

এই সিদ্ধান্তের যথার্থ নিরূপণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্য নিবন্ধের কয়েকটি উদ্ধৃতি মাত্র উল্লেখ করতে হবে। তিনি বলেছেন, ‘‘সংসার বৈষম্যপূর্ণ। সকল বিষয়েই বৈষম্য জন্মে। তোমার অপেক্ষা আমি কথায় পটু। আমার শক্তি অধিক, আমি বঞ্চনায় পটু— এ সকলই সামাজিক বৈষম্যের কারণ।’’ আর এক জায়গায় বলেছেন— ‘‘সমাজের উন্নতি রোধ ও অবনতির যে কারণ আছে, অপ্রাকৃত বৈষ্যম্যের অধিকাংশই তাহার প্রধান।’’ খুব স্বল্প কথায় অপ্রাকৃত বৈষম্য কথাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন প্রকৃতির সংসারে বৈষম্যই প্রধান। কিন্তু তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৈষম্য— যাতে কাজের সুবিধা হয়। বৈচিত্রের আনন্দ উপলব্ধ হয়। হাতের সব আঙুল সমান নয়। কিন্তু এই ছোট বড় আঙুল নিয়ে কাজকর্মে সুবিধাই হয়। সমান হলে বিঘ্ন ঘটত। এই অসাম্য ক্ষুব্ধ সমাজে স্থিরতা আনতে প্রচলিত সাম্যবাদকে পূর্ণ

সাম্যবাদ বলা যাবে না। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে যখন প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন ইত্যাদি দেশে গণবিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছিল তখনই কার্লমার্কসের ‘কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো’ প্রকাশিত হয়। একেই বলা হয় সাম্যবাদের গীতা। এর মূল বিষয়বস্তু, ধন বণ্টনের বৈষম্যই সকল বিপ্লবের কারণ। অতএব ধন বণ্টনের সাম্যই সমস্ত সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার। কেবলমাত্র ধন বণ্টনের সাম্যেই সমাজ সুরক্ষিত হবে একথা সত্য নয়। পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে শ্রমিক এবং মালিক সম্প্রদায়। শ্রমিকদের বঞ্চিত করে মালিক পুঁজিপতি হয়েছে, এরই পরিণাম গণ বিপ্লব। তার পরিণতি আমরা সকলে জানি।

শ্রীচৈতন্যের সময়ে ধন বণ্টন, মালিক, শ্রমিক, বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েত কথাগুলি ছিল না। কিন্তু সমাজে অসাম্য ছিল। তারও বহু যুগ আগে থেকেই তা লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতন্যের মতো তখনকার সমাজের শুভচিন্তক এই অসাম্য দূর করতে চেয়েছিলেন। তার উদাহরণ পাই বেদ ও উপনিষদের কিছু কিছু মন্ত্রের মধ্যে। অর্থাৎ মেনে নিতে হচ্ছে তখনও অসাম্য ছিল। স্বাভাবিকভাবে তা থাকবে। গুণ, কর্ম, পটুত্ব, জড়ত্ব মানুষের স্বভাব-গুণের বশবর্তী হয়ে বিশৃঙ্খলার মানুষের মধ্যে সাম্য আসতে বাধা দেয়।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি।।
সমানীবঃ আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।

অর্থাৎ ইহাদের স্তুতি একরূপ, প্রাপ্তি একবিধ, অন্তঃকরণ একরূপ, বিচারজ জ্ঞান এক বিষয়ে একীভূত হউক। আমিও তোমাদের তুল্যরূপ মন্ত্রকে সকলের ঐক্য বিধানের জন্য সংস্কার করি। হে দেবগণ, তোমাদের সকলের সাধারণ হবির দ্বারা আহুতি প্রদান করি।

এই মন্ত্রটিতে যেমন সাম্যের প্রার্থনা আছে তেমনি তার কারণ সমূহ স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। সত্যি যদি একবিধ অন্তঃকরণ হয়, যদি একরূপ বিচারজ জ্ঞান হয় তবে সাম্যের জন্য আর সমস্যা থাকে না। দেবপ্রতিম কোনো কোনো মানুষ বিক্ষুব্ধ সাম্যের ক্ষেত্র মধ্যে দাঁড়িয়ে যুগোপযোগী মন্ত্র তৈরি করেন। আগেই বলা হয়েছে, ইতিহাসে বুদ্ধ পরে শ্রীচৈতন্য এই কাজ সুষ্ঠু রূপে করেছেন। চিরকালীন না হোক আপাতত সমাজের চলন্ত সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই সমাজে অনেক দুষ্ট সামাজিক ব্যাধি ছিল। তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল মুসলমান শাসকদের অকথ্য অত্যাচার। এর ফলে ঘটেছিল ধর্মান্তর যা শাসককুলকে পুষ্ট করেছে, হিন্দু সমাজকে আরও নষ্ট করেছে।

অন্যদিকে পুরোহিত প্রাধান্য, স্মার্ত রীতি-নীতি, বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাবশেষ, ধর্মের নামে তান্ত্রিক ব্যভিচার, জমিদার সম্প্রদায়ের অসহ্য পীড়ন সমস্ত হিন্দু সমাজকে

ক্ষতবিক্ষত এবং দিগ্‌ভ্রষ্ট করেছিল। বাংলার এই দুঃসহ অবস্থায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হলো নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবীর ঘরে। ১৪৮৬ খৃস্টাব্দের দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যা। গঙ্গায় চন্দ্রগ্রহণের পুণ্যস্নান। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাদ্যের সঙ্গে তুমুল হরিধ্বনি। বিবরণ ভিত্তি করে কল্পনা করতে ইচ্ছা হয় জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যেন সাম্য সৃষ্টির অমোঘ অস্ত্র পেলেন— হরিনাম। পরবর্তীকালে দেখব, এই হরিনাম দিয়েই তিনি সবাইকে এক সূত্রে বেঁধেছেন। তবে তা অনেক পরে। ১৪৮৬ থেকে ১৫৩৩ এই সময়টুকু তাঁর স্থিতিকাল। এই সময়ের মধ্যেই তিনি সমাজে যে পরিবর্তন ঘটালেন তাতেই তাঁকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চরিতামৃত এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত অনুসরণ করলে জানা যাবে, পিতৃদত্ত নিমাই নাম থেকে শ্রীচৈতন্যে উত্তরণের কাহিনী। জানা যাবে--- অদ্ভুত মেধা ও পাণ্ডিত্য যা তৎকালীন নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল। জানা যাবে— চতুষ্পাঠী পরিচালন, প্রথমবার দারপরিগ্রহ, প্রথমা পত্নীর অকাল মৃত্যু, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ। পিতার পিণ্ডদানে গয়া গমন। দীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণের বিস্তৃত বিবরণ। তফাত এই যে, চরিতকারগণ প্রত্যেকেই চৈতন্য জীবনের প্রতিটি ঘটনার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করেছেন। তাঁরা সব সময়ই বলেন, ‘‘কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা’’, কিন্তু সাম্যবাদকে জাগতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ, যা করেছেন শ্রীচৈতন্য, তাঁকে উপলব্ধি করতে হলে ভক্তিপ্রেম ও তাঁর দেবত্বকে পূজার ঘরে সিংহাসনে রেখে মানুষ-শ্রীচৈতন্যকে বস্তুভিত্তিক যুক্তি দিয়ে দেখতে হবে।

মানুষ-শ্রীচৈতন্য সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁর ছিল না। বরং অন্যান্য পণ্ডিতদের উন্নাসিকতা, সাধারণ মানুষের প্রতি ঘৃণা এবং ঔদ্ধত্য তাঁকে পীড়া দিত। তাই সুযোগ এলেই উদ্ধত পাণ্ডিত্যকে তীক্ষ্ণ সমস্যায় ফেলে জর্জরিত করে আনন্দ পেতেন। তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল মানুষের এই অধঃপতনের মূল কারণ হীনমন্যতা এবং সংকোচ। এর জন্যই তাঁরা একাত্মতা উপলব্ধি করতে পারছেন না। অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি অবলম্বন করলেন নাম সংকীর্তনের মন্ত্রকে। এখানেই প্রথম পরিচয় হলো গুরু ঈশ্বরপুরির সঙ্গে। নামের এমন ক্ষমতা তিনি উপলব্ধি করলেন যা কিনা আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে এক করে দিতে পারে। তাঁর পণ্ডিত্যের খ্যাতি, চতুষ্পাঠী সবই ধীরে ধীরে অবহেলিত হতে থাকল। পিতৃ পিণ্ডদানের জন্য গয়া গিয়ে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করে বিভাজন বিবর্জিত হিন্দুসমাজের একত্রীকরণের একটা ছবি তৈরি করলেন। পুনরায় সাক্ষাৎ হলো নবদ্বীপে প্রথম দেখা এবং আকৃষ্ট হওয়া ঈশ্বরপুরির সঙ্গে। দীক্ষা নিলেন। তাঁর সংস্পর্শে থেকে কৃষ্ণনামের আন্তরশক্তিকে উপলব্ধি করলেন। সমস্ত বিভেদকে এক করার সম্মোহনী শক্তিলাভ করার সাধনা শুরু করলেন।

এবার নবদ্বীপ ফিরে তিনি অন্য মানুষ। নিমাই পণ্ডিতের শাস্ত্রালোচনা ত্যাগ করে নিরন্তর কৃষ্ণনাম পছন্দ করলেন। এ সময় কেবলমাত্র সমালোচনা নয় কটূক্তি, এমনকী নামকারীদের উপর উৎপীড়ন শুরু হলো। জগাই-মাধাই ও গোপাল-আপাল তার উদাহরণ হয়ে আছে।

কেবলমাত্র ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং নিষ্ঠার দ্বারা একটা বড় ধরনের নাম কীর্তনের দল তৈরি করে ফেললেন। যারা এতদিন সমাজে সম্পূর্ণ অবহেলিত এবং ঘৃণিত ছিল, তারা উৎসাহিত হয়ে উঠল। কারণ নিমাই পণ্ডিতের মতো একজন চৌকস পণ্ডিত ভাষ দিয়েছেন— ‘চণ্ডাল যদি হরিভক্তি পরায়ণ হয় তবে সে ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ’। বর্ণশ্রেষ্ঠরা কাজির কাছে এ অনাচারের বিচার চাইল। এর পরিণতি কি হলো তা জানতে ‘চরিতামৃতের সাহায্য নিচ্ছি।

‘‘ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী একঘরে আইল,
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল।
এতকাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও তার বল জানি।।’’
আদেশ হলো—
‘‘কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে।।
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইনু।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু।।’’

তারপর থেকে মানুষ ভয়ে ঘরের মধ্যে নামগান শুরু করল। চৈতন্যের কাছে তাদের মনোবেদনা প্রকাশ করে প্রতিকার চাইল।

প্রসঙ্গত বলা যায়, হাবসী শাসনের অবসান করে যখন হুসেনশাহ বাংলার শাসক হলেন সেই সময় থেকেই নাকি বাংলাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার যুগ ফিরে এসেছিল। কেউ কেউ আবার শাহী বংশের সময়কে বাংলার স্বর্ণযুগ বলতে দ্বিধা করেননি। অথচ এই আমলেই যবন হরিদাসকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত হজম করতে হয়েছিল কেবল হরিনাম করার জন্য। কোথাও মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দিয়ে ভয় দেখান হয়েছিল, এরপর আবার হরিনাম প্রকাশ্যে করলে তাকে ধর্মান্তরিত করা হবে। যাই হোক মানুষের এই মনোবেদনা চৈতন্যকে ক্রুদ্ধ করেছিল। ক্রুদ্ধ চৈতন্য আদেশ দিলেন—

‘‘নগরে নগরে আজি করিনু কীর্তন
সন্ধ্যাকালে কর সর্বে নগর মন্থন
সন্ধ্যাতে দেউটি সব জাল ঘরে ঘরে
দেখ কোন কাজী আসি মোরে মানা করে’’।।

শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ মতো মৃদঙ্গ, করতাল আর মুখে কৃষ্ণনাম নিতে নিতে বিপুল জনতা নগর পরিক্রমা শুরু করল। কৃষ্ণদাস কবিবাজ এর বর্ণনা দিয়েছেন—

‘‘তর্জ গর্জ করে লোক করে কোলাহল
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল।’’

‘প্রশ্রয় পাগল’ যুগ্ম শব্দটির মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠে আসে তা হলো কার ‘প্রশ্রয়’? ভক্ত বলবেন— গৌরচন্দ্রের। আমরা সাধারণ মানুষ বলব সঙ্ঘশক্তির প্রশ্রয়। এই সংগঠন তৈরি করেছেন শ্রীচৈতন্য, তাঁরই পরিকল্পনায় বিজয়যাত্রা সংঘটিত হয়েছে। কৃষ্ণদাস যখন বলেন ওই সংকীর্তন কাজীর দ্বার প্রান্তে পৌঁছুলে— ‘‘উদ্ধত লোক ভাঙে কাজীর ঘর পুষ্পবন’’— মানুষ তখন আর কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত নয়, অনেক দিনের সুপ্ত ক্ষোভ উগরে পড়েছিল সঙ্ঘশক্তির অপরাজেয় বিক্রমে। উদ্ধত কাজী ভয়ে লুকিয়েছেন। তারপর ভয়ে

ভয়ে এসে মিলিত হলেন গৌরচন্দ্রের সঙ্গে। নানা প্রশ্নোত্তর চলে। সব শেষে—

''বিচারিয়া কহে মোর বংশে যত উপজিবে
তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে।।''

কেবল নবদ্বীপ ধামটুকুর মধ্যে এই সাম্যবাদের সঙ্ঘশক্তি ফলবতী হলেও ভারতের আপামর জনসাধারণ দুঃসহ মনোকষ্টে জীবন যাপন করছে এটা গৌরহরি জানতেন। আর এও জানতেন হিন্দুদের মধ্যেই বেশ কিছু শাস্ত্রাচারী মানুষ শ্রীচৈতন্যকে ভাল চোখে দেখে না। তাই তাঁর পরিকল্পনা হলো সন্ন্যাস নেবেন। কারণ হিসাবে তিনি বলছেন—

''মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার
এসব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব
সন্ন্যাসী বুদ্ধে মোরে প্রণত হইব।''

এরপর যে সব বৈষ্ণবীয় ভাবের বিশ্লেষণ আছে আপাতত যেগুলি সরিয়ে রেখে স্থূল দৃষ্টিতে দেখছি সন্ন্যাস গ্রহণের ভাবের অর্থ যাই হোক বাইরের অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। যখন তিনি বলেন, বিষয়াদি সব কিছু ত্যাগ করে অকিঞ্চন হতে পারলেই মানুষ তাকে নেতা বলে মানবে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যা করলেন তার বিশদ বিবরণ অচিন্ত্য অখণ্ড গৌরাঙ্গে দেখতে পাই। তিনি বলেন— 'সন্ন্যাসী হতে হলে সব ত্যাগ করতে হয়'। শ্রীচৈতন্য মাতৃস্নেহ ত্যাগ করেছেন, পতিপ্রাণা স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন, আপনার শাস্ত্রজ্ঞানের মনোময় ভাণ্ডার ত্যাগ করেছেন, সব শেষে ত্যাগ করেছেন তাঁর জন্মভূমি নবদ্বীপ। মানুষ এবার তাঁর কাছে প্রণত হচ্ছে, তাঁর কথা শুনছে, সেই পথ অবলম্বন করেছে। কেবলমাত্র কথা দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে তিনি পরবর্তীকালে সাম্যবাদীর জীবনযাত্রা কি হওয়া উচিত তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

শ্রীচৈতন্যের জীবনে মোট তিনটি পর্ব— গৌড়, পরিব্রাজন ও নীলাচল। নীলাচলে এসে, নবদ্বীপে ছেড়ে আসা সংগঠনকে ধরে রাখতে নিত্যানন্দকে নিয়োগ করেন। উনি চললেন বৃন্দাবন, মথুরা, দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায়। তিনি যেখানে যেখানেই গিয়েছেন সর্বত্র সংকীর্তনের রোল উঠছে। দূরদর্শী শ্রীচৈতন্য নিমাই পণ্ডিত থাকাকালীনই তপন মিশ্রকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছেন। পরবর্তীকালে অনেককেই পুরী ও বৃন্দাবন পাঠিয়েছেন। নীলাচলে তাঁর অবস্থিতি একটি বাঙালি উপনিবেশ তৈরি করেছে। তেমনি মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদিতেও সর্বত্যাগী হওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্যের কথা বেদবাক্য বলে অধিকাংশ মানুষ মনে করেন। শ্রেণীতে শ্রেণীতে জাতি-ধর্ম প্রভেদের কু-আচার আর রইল না। 'অখণ্ড অমিয় গৌরাঙ্গ' গ্রন্থের রচয়িতা অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বলেন— শুধু ধর্ম ভাব নয়, শ্রীচৈতন্য সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ নেতা, আর সত্যিকারের সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ সূচী ২০১৪

ভ্রমণ	মুখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
কাশ্মীর	জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও, বৈষ্ণোদেবী	১৩	১৭ই মে	১৪,৫০০/-
দার্জিলিং	টাইগার হিল, ঘুম মনেস্ট্রী, বাতাসী, মিরিক	৬	৩০শে মে	৬,০০০/-
সিমলা	সিমলা, কুফরি, মানালী, রোটাংপাস, কুলু, মনিকরন	১১	১৮ই মে	১১,২০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার-হৃষিকেশ, লক্ষ্মনঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী	৮	২৭শে মে	৬,২০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর তিন মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস), বড়/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ,ডিনার (আমিষ/নিরামিষ),টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া,ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে,হাতি/ঘোড়া চাপা, পুজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

✷ ভ্রমণ শুরু ও শেষ, হাওড়া/শিয়ালদহ/ কোলকাতা অথবা উল্লেখ্য নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে ✷ হঠাৎ করে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি অথবা ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে প্যাকেজ মূল্য বর্ধিত হবে। ✷ বালক / বালিকাদের ক্ষেত্রে (৫-১১ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ৭৫% টাকা লাগবে। শিশুদের ক্ষেত্রে (২-৪ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ২৫% টাকা লাগবে।

বিজ্ঞানের আলোয় দোল ও দীপাবলি

সৌমেন নিয়োগী

হিন্দুদের যে কোনো আচার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উৎসব সবকিছুই বিভিন্ন সময় ও মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ধারণের মধ্যেই নিহিত। বছরের বারো মাসের মধ্যে মূল যে দু'টি উৎসব সর্ববৃহৎরূপে একত্রে সমগ্র ভারতজুড়ে পালিত হয়, জাতি, প্রদেশ নির্বিশেষে তা হলো দোল বা হোলি এবং দীপাবলি। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জন্মায় এর পিছনে কারণ কি? ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ, তথাপি একবিংশ শতকে মানুষ সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের চোখে দেখতে চায়, তখন প্রশ্ন আসে বিজ্ঞান কি সংস্কৃতির বাইরে, না সংস্কৃতির বিশেষ রূপ? দোল ও দীপাবলি এই দু'টি উৎসব বছরে দু'টি বিশেষ সময়ে হয়ে থাকে এবং দুইটির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে এক 'মহাজাগতিক তাপগতিবিদ্যার' (Cosmic Thermodynamic's) অমোঘ সত্য।

প্রথমে দোল উৎসব পালিত হয় সূর্যের উত্তরায়ণে (Spring equinox) যার অর্থ সূর্য ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর অক্ষাংশের দিকে যাত্রা শুরু করে কর্কটক্রান্তিরেখায় (|Tropic of Cancer) উপস্থিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে তাপ ও শক্তির বৃদ্ধি ঘটিয়ে পুনরায় ধরণীতে সূর্যের পুনরুত্থান। পর্বত শিখরে জমাট বরফের ঘনীকরণের সূচনা ও বৃষ্টির আগমনে তাপের অভাবে রুক্ষ সূক্ষ্ম, মৃতপ্রায় শীতল ধরিত্রী আবার প্রাণের স্পন্দনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সেই মৃত্যুসম পৃথিবীর রস সিঞ্চনের মধ্যে যে পুনরায় পুষ্টি প্রেরিত হয়, সেই আনন্দকে স্বাগত জানানোর জন্যই দোল উৎসব পালন। শক্তি যেমন সকল জীবের সৃষ্টির স্বরূপ, সেই শক্তির বৃদ্ধিতে শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর ফসল সমস্ত জীবকুলকে মৃত্যুর থেকে জীবনের উদ্দেশ্যে পুনঃরুত্থান করতে সাহায্য করে এবং হেমন্তের আগমনে সূর্যের দক্ষিণায়ন অর্থাৎ মকরক্রান্তি (Tropic of Capricorn) দিকে অগ্রসর হওয়া ফলত তাপ নিষ্কাশন। শৈত্য প্রবাহ, পৃথিবীর জীবকুল এক অচল অবস্থায় সম্মুখীন হয়। তাপের অভাবে সমস্ত ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর প্রাণের গতি যাতে সেই দারুণ কঠিন সময়কে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় তার ফলেই পালন হয় দীপাবলি। দীপাবলির পরেই সূর্য অবস্থান করে Tropic of Capricorn-এ,

দোল	দীপাবলি
১. রঙের উৎসব।	১. আলোর উৎসব।
২. সূর্যের উত্তরায়ণের (spring equinox) নিকটস্থ সময়ে।	২. সূর্যের দক্ষিণায়ণের (Autumnal equinox) ঠিক পরেই।
৩. পালন হয় একটি দিনের অনুষ্ঠান হিসাবে অর্থাৎ পূর্ণিমায়।	৩. পালন হয় রাত্রে, ঘোর অমাবস্যায়।
৪. সূর্যের উত্তরায়ণের (Tropic of Cancer) দিকে যাত্রা নির্দেশ করে।	৪. সূর্যের দক্ষিণায়ণের (Tropic of capricon) দিকে যাত্রা নির্দেশ করে।
৫. অগ্নির বৃদ্ধি বা তাপের বৃদ্ধির ফলে জাগতিক তাপগতি শক্তির ইঞ্জিনের Isothermal ও Adiabatic সম্প্রসারণ Tropic of Capricorn — Equator—Tropic of Cancer.	৫. সোম বৃদ্ধি বা তাপের নিষ্কাশনের ফলে জাগতিক তাপগতি শক্তির ইঞ্জিনের (Isothernal ও Adiabatic সংকোচন। Tropic of Cancer--Equator-- Tropic of Capricorn.
৬. আলোর বর্ণ বিচ্ছুরণ হয় সাতটি বর্ণে (ie spectral Dispersion of white light) ফলত রঙের। বর্ণের উৎসব।	৬. আলোক বর্ণের আত্তিকরণ (Spectral Absorption), ফলত আলোকের উৎসব।

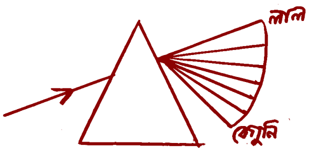

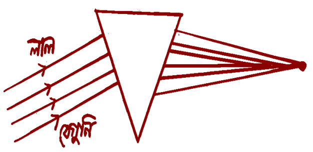

দোল	দীপাবলি
৭. জীবনের পুনরুত্থান, তাই জগত ব্যাপ্ত পুরুষের আবাহন অর্থাৎ বিষ্ণু নারায়ণের পূজা ইত্যাদি এবং রুদ্রের স্তুতি।	৭. জীবন ধারণ, তাই দেবীর অর্থাৎ লক্ষ্মী বা কালীর আরাধনা।
৮. মহাজাগতিক ঘটনা হলো চন্দ্রগ্রহণ।	৮. মহাজাগতিক ঘটনা হলো সূর্যগ্রহণ।

ফলে চরম তাপ বর্জিত এক অবস্থা থেকে যখন তাপের আবার বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ সূর্যের পুনরুত্থান সেইদিন 'মকরসংক্রান্তি' রূপে পালিত হয় যা এই মহাজাগতিক তাপবিদ্যার ইঞ্জিনের নতুন ইন্ধন দেয়। হেমন্তর থেকে শীত ও সেখান থেকে বসন্তের আগমন, এই চক্রাকার জাগতিক চক্র যা দু'টি Isothermal ও দুটি Adiabatic চক্র দিয়ে গঠিত বর্তমান Thermodynamic এর Carnoticycle-এর সঙ্গে সঙ্গতিভাবে সাদৃশ্যস্বরূপ।

আর্য ঋষিগণ সেই অমোঘ সত্যকে রুদ্রের বা শিবের মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র দিয়ে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন। আধুনিক কালের ভারতের কবি প্রজ্ঞায় সেই অতীন্দ্রিয় শক্তিকে আবাহন করেছেন তার ঋতু পর্যায় গানের মধ্যে ''হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী''।

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ আয়োজিত

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলন

২৩ মার্চ ২০১৪ রবিবার, সকাল ৮-৩০ মিঃ

স্থান : কেশব ভবন

৯এ অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রতিনিধি শুল্ক : ২৫০ টাকা

এই সম্মেলনে প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, ছাত্র ও অনুরাগীদের যোগদানের আবেদন জানাই।

—ঃ যোগাযোগ ঃ—

ডাঃ জে. কুণ্ডু (মোবাইল নং-৯৪৩৩৮২০১৬৫)
ডাঃ পি. কুণ্ডু (মোবাইল নং-৯৮৩১৪৯১৬৫৮)
ডাঃ এন. অধিকারী (মোবাইল নং-৯৮৩১৭১০৭৮৮)
ডাঃ এ. চৌধুরী (মোবাইল নং-৯৬৪৭৬৫৬২৪৫)

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company

'Park Plaza'

71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–

emil : roy4258@yahoo.com
web : www.calcuttawaterproofing.com

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

রাজ্যের জন্য সংস্করণ ছাড়া ‘বেসু’-র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে উত্তরণ পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থবিরোধী

চিঠিপত্র

পূর্বতন শিবপুর Bengal Engineering College 1856 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, (এটি ভারতের দ্বিতীয় সর্বপ্রাচীন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ) বর্তমানে Bengal Engineering and Science University (BESU), দেড়শতাধিক বৎসরেরও অধিক পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং ও প্রযুক্তি পঠন-পাঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে তিন হাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী এখানে পড়াশোনা করে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, তার ৮০ শতাংশ ছাত্র মফস্‌সল এলাকা এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসে। Private Engineering College-এ উচ্চহারে বেতন দিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সামর্থ্য তাদের নাই।

অনন্দকৃষ্ণণ কমিটি Benaras Hind University-Institute of Technology (IT), Cochin University of Science and Technology (CUSAT), Headrabad Osmania University এবং Andhra University College of Science-কে IIEST-Institute of Engineering, Science and Technology-তে IIT-র সমপর্যায়ে উন্নীত করার সুপারিশ করে।

BESU সংক্রান্ত বিলটি শ্রী বীরেন্দ্র সিং-এর অধ্যক্ষতায় Standing Committee (SC)-তে পর্যালোচনার জন্য যায়। Standing Committee-তে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার ডেরেক ও ব্রায়েন এবং লোকসভার প্রশান্ত মজুমদার সদস্য ছিলেন। ইতিমধ্যে BHU-IT-কে BHU -IIT-তে উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য— BHU একটি Central University. Cochin University IIEST (Indian Institue of Science and Technology) CENTRAL status প্রত্যাখান করেছে।

বর্তমানে তন্মধ্যে শুধু BESU-কেই IIEST-তে উন্নীত করতে Bill "The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Bill, 2013" লোকসভাতে এবং রাজ্যসভাতে পাশ হয়ে গেছে। প্রণিধানযোগ্য যে **BESU-ই প্রথম State University যা Central Institute হচ্ছে।**

বিলটি Standing Committee on human Resource and Development-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল। Standing Committee এ বিষয়ে ২৫৯তম রিপোর্ট 9th Dec, 2013 পেশ করে এবং খুব জোরালোভাবে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদের জন্য National Institute of Technology-এর আদলে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের জন্য সুপারিশ করেন। এ বিষয়ে Standing Committee পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেওয়া কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (MHRD) পত্র নং 11-5/2006-TS dated 27th/28th December, 2007 এর উল্লেখ করেছেন যাতে কেন্দ্র সরকার রাজ্যসরকারকে সুনির্দ্দিষ্টভাবে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের আশ্বাস দিয়েছেন।

উল্লেখ্য State Engineering College গুলি National Institute of Technology (NIT)-তে উন্নীত করার সময় রাজ্যের ছাত্রদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। যেমন হামীরপুর, পোদুচেরী এবং আমাদের রাজ্যের দুর্গাপুরে এ রাজ্যের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই সংরক্ষণ কিন্তু একই বিল ‘*The National Institutes of Technology, Science Education and Research Bill, 2013*’ এর মধ্যেই করা হয়েছে। সংরক্ষণ সংক্রান্ত Standing Committee-র মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"3.4 The Committe fails to understand the reasons for the Central Govenment withdrawing from its earlier categorical commitment on an issue having very far-reaching ramifications so far as the students of the State are concerned. The Committee strongly feels that like in the case of NITs, where special relaxation was given by having an MOU between State Governments and MHRD entailing reservation of seats for the local students, the same has to be extended to IIEST, Shibpur also. It has all the more reason to do so as a very old and well-established engineering college turned into State University in the year 2004 catering to the educational needs of the students of West Bengal. The Committee, therefore, recommends to the Department to address this area of concern so as to safeguard the interests of the students in the statutes as done in the case of NITs. The Committee would like to point out that the proposed legislation is being brought forward for converting another institution run by the State Govenment catering to the needs of State Students into an Institutions of National Importance. The Committee is, therefore of the view that reservation for students of West Bengal to the extent possible may be retained in IIEST, Shibpur.

কিন্তু বিলটি তাড়াহুড়ো করে কোনও আলোচনা ছাড়াই Standing Committee-র সুপারিশ ও মতামত অগ্রাহ্য করে পাশ হয়ে গেছে। এটি আমাদের রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী। এটি Central Institute IIEST (Indian Institute of Science and Technology) হয়ে যাওয়ার পর West Bengal Joint Entrance পরীক্ষা দিয়ে বাঙ্গলার ছাত্ররা আসতে পারবে না। সারা ভারতে IIT এর Joint Entrance পরীক্ষা দিয়ে তাদের আসতে হবে। ফলত, বাঙ্গলার ছাত্ররা বিশেষত মফস্‌সল এলাকার দরিদ্র মেধাবী ছাত্ররা একান্তভাবে বঞ্চিত হবে। তাই আমাদের আবেদন, দলমত নির্বিশেষে সমস্ত এমপি, রাজনীতিবিদ ও জনসাধারণ সংরক্ষণের দাবিতে সোচ্চার হন।

আমাদের রাজ্যে খড়্গপুরে IIT ও জোকায় IIM আছে। কিন্তু সেখানে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের তুলনায় IIT ও IIM-এ পশ্চিমবঙ্গের উপকৃত ছাত্রের সংখ্যা অতি নগণ্য। রাজ্যের জন্য সংরক্ষণ ছাড়া কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হওয়া পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদের কাছে বড় ধাক্কা।

—অধ্যাপক নির্মল মাইতি,
সাধারণ সম্পাদক,
জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ।

বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে এবার কাজ হোক

শ্যামল কুমার হাতি

রাজ্য বিজেপি নরেন্দ্র মোদীকে এনে ব্রিগেডে একটা বড় সভা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর নজর কেড়েছে। দলের অনেকের আশা এবার বাংলায় বিজেপি দু-একটা আসন পেলেও পেতে পারে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, নরেন্দ্র মোদীর জন্য সারা ভারতে বিজেপি সর্বাধিক আসন পাবে এবং বর্তমান শাসকদল কংগ্রেস অনেক পিছিয়ে পড়বে। কংগ্রেস এবং বিজেপিকে বাদ দিলে প্রকৃত জাতীয় দল আর নেই। যদিও অনেকেরই নির্বাচন কমিশনের বদান্যতায় জাতীয় দলের স্বীকৃতি আছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের জাতীয় ভাবনা নেই। তারা ভাষা, প্রান্ত, জাত-পাত বা ধর্মের সওদাগর মাত্র। কেউ কেউ আবার যখন যেমন তখন তেমনের মতো। তাদের জাতীয় ভাবনা নেই। যেটা আছে সেটা হলো কীভাবে সংসদ বা বিধানসভায় আসন সংখ্যা বাড়ানো যায়। প্রয়োজনে দৃঢ়তার সঙ্গে কাউকে 'আর-না' বলার পর আবার পায়ে হাত দিয়ে ছবি তুলতে বাঁধে না— এটাই তার একমাত্র প্রমাণ। নিজের ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে তুষ্ট করার যে অপচেষ্টার প্রতিযোগিতা আমাদের দেশের বেশ কয়েকটি দল কয়েক বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে তা সবাই জানি। নতুবা জেনে বুঝে চুপ করে থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে করি। অন্য দিকে কম্যুনিস্টরা 'নো গড, নো রিলিজিয়নের' কথা বললেও তোষণের কাজে তাদেরও জুড়ি মেলা ভার। এ যেন 'নিজের বেলায় আঁটি সুটি অন্যের বেলায় দাঁতকপাটি।'

আমাদের দেশের সাংবাদিকরা প্রায় প্রশ্ন করেন, গুজরাটে কেন বিজেপি মুসলমান প্রার্থী রাজ্য বিধানসভায় দেয় না। তারা কিন্তু সিপিএম বা তৃণমূলকে প্রশ্ন করে না কেন তারা মালদা, মুর্শিদাবাদে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দু প্রার্থী দেয় না? ওখানে কি ভাল বা হিন্দু সৎ কমরেড বা তৃণমূলী নেই? সবাই সব উত্তর জানে তবু যদি একটু বিজেপি-কে চুলকানো যায়। এবার আর তাতে লাভ হবে না। তাই শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দলটি জানে এবার তার হাতে ভোট নেই। হাত দিয়ে ভোট কুড়াতে না পারলে কি হবে ঝাড়ু দিয়ে জড়ো করে তো তোলা যায়! দিল্লীতে তো ওরা তা করে দেখিয়েছে। তাইতো দিল্লীর কংগ্রেস বিধায়ক অরবিন্দ সিং লাভলী বিধানসভায় বিজেপি নেতা হর্ষবর্ধনকে সদর্পে বলতে পেরেছেন, ''আমরা আগেও সরকারে ছিলাম, এখনও আমাদের সমর্থনে সরকার চলছে। আপনারা কালও সরকারের বাহিরে ছিলেন আজও সর্বাধিক আসন পেয়েও সরকারের বাহিরে।'' একেই বলে নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করা। কংগ্রেস কিন্তু বসে নেই। ১১ পার্টির দলের কেউ কেউ বলছে যতই যাই হোক, আমরা নরেন্দ্র মোদীকে সরকার গড়তে দেব না। তারা কেউ বলছে না কখনই কংগ্রেসের সমর্থন নেব না বা তাদের সমর্থন দেব না। সবাই আসলে ছদ্ম কংগ্রেসি। ভুললে চলবে না মনমোহন সিং সরকারের ১০ বছরের শাসনে যত চুরি-জোচ্চুরি হয়েছে তার প্রথম পাঁচ বছরের সরকারের প্রাণভোমরা ছিল বামপন্থীরা আর পরের পাঁচ বছরের প্রাণভোমরা ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ইউপিএ সরকারের অন্যায় কাজের দায়ও তাদের নিতে হবে। এখন তো অন্য কথা বললে চলবে না। রাজনীতিতে নির্বান্ধব হয়ে থাকা যায় না বলেই এখন 'আর-না' প্রণাম।

তবে দুঃখের কথা হলো, আমাদের রাজ্যে কি হবে? সেই কংগ্রেস, তৃণমূল আর বামপন্থীরাই থাকবে, না গোটা ভারতবর্ষের মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ রাজ্যেও পদ্মফুল ফুটবে। রাজ্য বিজেপিতে তো দীর্ঘদিন ধরে খরা চলছে। পাহাড়ের দৌলতে এ রাজ্য থেকে একজন সাংসদ থাকলেও বিধানসভায় কেউ নেই। সবাই দিল্লীর দিকে মুখ চেয়ে বসে আছে। অন্য রাজ্যে বিজেপির বিজয় রথ ছুটবে আর আমরা পুলকিত হবো এভাবে চলবে না। বাংলাকে বাঁচাতে হবে। সংখ্যালঘু তোষণকারীদের হাতে বাংলা নিরাপদ নয়। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধরা নির্যাতিত হলেও ভোটের লোভে এখানকার সরকার বা কম্যুনিস্টরা ভুলেও একটা কথা বলে না। আমাদের রাজ্যের সাংবাদিকরাও তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের বিরাগ ভাজন হওয়ার ভয়ে একটি কথাও লেখে না। এর থেকে বাংলাকে বের করতে বিজেপি-কে এগিয়ে আসতে হবে। এই বাংলায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় জনসঙ্ঘের জন্ম দিয়েছিলেন। তাদের নেতা এবং কর্মীরাই আজকের বিজেপি-র সম্পদ। তাই খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন বাংলায় আজ এই খরা কেন? এই খরা কাটাবার উপযুক্ত সময় এখন। মনে রাখতে হবে, বিজেপি করে যেদিন বাংলার মানুষের কাজ হবে, বাংলার মানুষের উন্নতি হবে, সেদিনই বাংলার মানুষ বিজেপি-কে গ্রহণ করবে। বিজেপি-র নীতি আদর্শ সবাই জানে। চাই শক্তিশালী সংগঠন।

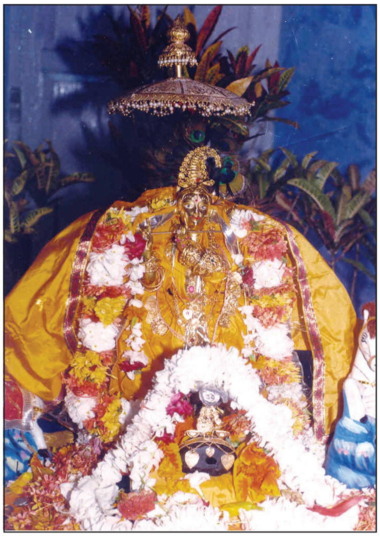

রাজবাড়ির দোল

নবকুমার ভট্টাচার্য

এখনও অভিজাত হিন্দুর পরিচয় দিতে হলে বলা হয়— 'তাঁর বাড়িতে দোল, দুর্গোৎসব হয়'। দুর্গাপুজো শরৎকালের আর দোল বসন্তের। হিন্দুর পুজো উৎসব ঋতু-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়েই তৈরি হয়েছে। বসন্ত হলো দীর্ঘ প্রত্যাশার পর প্রিয় মিলনের মধুর সমারোহের মাস। প্রকৃতি তখন নতুন সাজে সেজে ওঠে আর অন্তরঙ্গ ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগের অপ্রাকৃত আনন্দে সেজে ওঠে ভক্তের মন। প্রকৃতিও তাই সেজে ওঠে অনুরূপ ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে। গোটা ভারতে দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে শুধু রঙের উৎসব নয়, মিলনের উৎসব হিসেবেও পালন করা হয়। ভারতের বহু রাজ্যে সুদূর অতীতের রাজতন্ত্রের আমল থেকেই এই উৎসব পালন হয়ে আসছে। যদিও এখন রাজতন্ত্র নেই। তবু ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনেই পালিত হয় রাজবাড়ির দোল উৎসব।

কোচবিহারের দোল মানেই মদনমোহন। কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন এই দিন সেজে ওঠেন নানা রঙে। কোচবিহারের রাজবাড়ির ইতিহাস বলে, দোলের দিন এককালে কোচবিহারের রাজপরিবার এই মদনমোহনের সঙ্গেই প্রথম দোল খেলতেন। রাজবাড়ির সেই রমরমা আজ আর না থাকলেও কোচবিহারের আবালবৃদ্ধবনিতা এখনও রঙ নিয়ে দোলের দিন হাজির হন মদনমোহনের মন্দিরে। এদিন মদনমোহন ঠাকুরের বিগ্রহ মন্দির থেকে বের করে এনে রাখা হয় মন্দির চাতালে। কোচ রাজপরিবারের কুলদেবতা মদনমোহন। ১৮২৮ খৃস্টাব্দে কোচ রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর কুলদেবতার জন্য তৈরি করেন মদনমোহন মন্দির। এর পূর্বে মদনমোহন পূজিত হতেন রাজপ্রসাদে রাজমাতার নিজস্ব মন্দিরে। রাজমাতা প্রতিবছর এই দোলের দিনই মদনমোহনকে রাজপ্রাসাদের বাইরে বের করতেন এবং আপামর কোচবিহারবাসী তাঁর দর্শন পেত। প্রথমে রাজবাড়ির মূল ফটকের কাছে ছিল এই মন্দির। পরে উনিশ শতকের শেষ ভাগে ১৮৮৯ সালে রাজবাড়ি থেকে বেশকিছু দূরে বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় থেকেই মদনমোহনের দোল উৎসব কোচবিহারের সাধারণ মানুষের প্রাণের উৎসব। এখনও রীতি মেনে ময়দানে পোড়ানো হয় 'বুড়ির ঘর' যা বন্ধু উৎসব নামে পরিচিত। এই উৎসবে মদনমোহন মন্দিরে আসে বাণেশ্বর শিব মন্দিরের শিব এবং যণ্ডেশ্বর মহাদেব। এখনও পরে পঞ্চমদোল পালিত হয়।

পুরুলিয়ার পঞ্চকোট রাজবাড়ির দোল উৎসবের ঐতিহ্যও কম নয়। ২০০ বছর ধরে পঞ্চকোট রাজবাড়ির দোল উৎসব চলে আসছে। চৈতন্যদেবের নির্দেশে তারই পার্শ্বসহচর নিত্যানন্দকে সংসারি হতে হয়। তিনি ঘর বাঁধলেন বীরভূম জেলায়। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামী সারাজীবন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বীরচন্দ্র তাঁর তিন পুত্রকে পাঠালেন তিন দিকে। গোপীজন বল্লভ গেলেন মালদা জেলার নোতাগ্রামে। রামচন্দ্র গেলেন উত্তর ২৪-পরগণার খড়দহে এবং রামকৃষ্ণ গোস্বামী গেলেন পুরুলিয়ায়। বরাভূম রাজ্যের রাজা হরিশচন্দ্রের সাদর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি প্রেমধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। এই ঐতিহ্য মেনে রাজপরিবারের উত্তরসূরিরা এখনও দোল উৎসব পালন করেন। পুরুলিয়ার বেগুনকোদর স্টেটের দোল উৎসবও শুরু হয়েছিল সরাসরি রাজ আনুকূল্যে। এই অঞ্চলের রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটি বৃন্দাবনের ধাঁচে তৈরি। দোলের দিন বিগ্রহ দোলায় চড়িয়ে সারা গ্রামে ঘোরানো হয়। হয় আবির উৎসব।

প্রাচীন মল্লরাজধানী মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের নাম উল্লেখযোগ্য। বীর হাম্বীর বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরই গোটা রাঢ়বঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিরসের ধারা প্রবাহিত হয়। বসন্ত উৎসবকে ঘিরে পুজোপাঠ ছাড়া নামসংকীর্তন ও নগর পরিক্রমার ধুম পড়ে যায়। মল্লরাজারা দোল উৎসবকে বর্ণময় করে তুলেছিলেন। সেই ঐতিহ্য এখনও চলছে। সোনামুখী অঞ্চলের দোল উৎসবের একটা ইতিহাস রয়েছে। এই অঞ্চলের দুই বনেদি পরিবারের উদ্যোগে আয়োজিত হোত এই উৎসব। সেই রীতি মেনেই 'খর' ও 'দৈ' পরিবারের দোল উৎসব যা আজও অমলিন।

বর্ধমান রাজবাড়ির দোলের এককালে আলাদা মাত্রা ছিল। দোলের সন্ধ্যায় দু'জন ব্রাহ্মণের একজন কোলে নিতেন রাধাকে অন্যজন কৃষ্ণকে। ব্রাহ্মণদের ধুতির খুঁটে বাঁধা থাকত আবির। কাঁসর ঘণ্টার তালে নেচে নেচে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিতে রঙ মাখানো হোত। আবির ছড়ানো হোত মন্দির চত্বরে। পূর্ণিমার সন্ধ্যায় দেবতাদের প্রথম রঙ দিতেন রাজা তারপর অন্যান্যরা। পরদিন ভোর থেকে রঙ আবির নিয়ে হোলির আনন্দে মেতে উঠতেন রাজা ও অন্যান্যরা। রাজবাড়ির দোলের প্রসাদের যথেষ্ট বিশেষত্ব ছিল। রাজবাড়ির ভিয়েনখানায় বানানো হোত অঢেল মালপোয়া, রাবড়ি, দরবেশ ও লাড্ডু। সঙ্গে অন্নভোগ হোত। প্রত্যেক প্রজাই পেট ভরে এই প্রসাদ খেতেন। আজ যদিও ৫২ পদের অন্নভোগ হয় না তবে দেবতাকে আজও মালপোয়া দেওয়া হয়। ১৭৪১ খৃস্টাব্দে বর্ধমানের প্রথম স্বীকৃত রাজা চিত্রসেনের আমল থেকে এই দোল উৎসব দু'দিন ধরে চলে আসছে। বর্ধমান রাজ প্রতিষ্ঠিত রাধানাথ জিউ'র মন্দিরে এখনও জাঁকজমক ভাবে দোল উৎসব হয়।

মনীষীর মা

চৈতন্য-জননী শচীদেবী

রূপশ্রী দত্ত

চৈতন্য-জননী শচীদেবীর পিতা ছিলেন বেলপুকুরিয়া নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তী। নীলাম্বরের একমাত্র কন্যা শচী ও দুই পুত্র যোগেশ্বর ও রত্নগর্ভ। কালক্রমে নবদ্বীপ নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে শচীর বিবাহ হয়েছিল। শচী আটকন্যার জননী হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জন্মের পরে পরেই সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তারপর জন্ম হয় দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভরের। বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর যথাক্রমে বলরাম ও কৃষ্ণেরই নবকলেবরে জন্মান্তরিত প্রতিরূপ।

যৌবনের প্রারম্ভেই বিশ্বরূপ শচীকে কাঁদিয়ে গৃহত্যাগী হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তার কিছুকাল পরেই স্বামী জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু। এই সময় বিশ্বম্ভর অর্থাৎ বালক নিমাইকেই শচী একমাত্র অবলম্বন হিসেবে নির্ভর করেছিলেন। বালক পুত্রের কোনও দৌরাত্ম্যেই তিনি ক্রুদ্ধ হতেন না।

গয়াতে পিতৃদেবের পারলৌকিক কাজ সেরে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই শচীর চোখে নিমাইয়ের এক অদ্ভুত পরিবর্তন ধরা পড়ল। বালকসুলভ চাপল্য, দৌরাত্ম্য একেবারেই অন্তর্হিত। অর্ধনিমীলিত চোখে বাক্‌হারা নিমাই শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। শচীদেবীর অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে ওঠে। পুত্রের স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়ে আনতে তিনি কবিরাজের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু যেহেতু ভগবদ্ভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমই এই তথাকথিত আপাত-অস্বাভাবিকত্বের হেতু— তাই কোনও ওষুধই কার্যকরী হলো না।

অবশেষে শচী ভাবলেন বিবাহ দিলে হয়তো নিমাই আবার স্বাভাবিক হবে। তাই লক্ষ্মীপ্রিয়া নামের এক সর্বসুলক্ষণ যুক্তা কন্যার সঙ্গে তিনি নিমাইয়ের বিবাহ দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের অল্প পরেই লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। শচী শোকে অধীর হয়ে পড়লেন। নিমাই তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন লক্ষ্মীপ্রিয়া আসলে বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মী। সময় হওয়াতে তিনি আবার বৈকুণ্ঠে ফিরে গেছেন।

এর কিছুকাল পরে, শচীর একান্ত ইচ্ছায়, বিষ্ণুপ্রিয়া এলেন নিমাইয়ের বধূ হয়ে। শচীর মন কিঞ্চিৎ শান্ত হলো। কিন্তু ঈশ্বরচিন্তায় যে একবার বাঁধা পড়েছে কোনও জাগতিক বন্ধনে তো তাকে বাঁধা যায় না। তাই নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরের আর্তি অনুভব করে শচীর হৃদয় বেদনায় ভেঙে পড়ল। তিনি নিজে সংযত হলেন ও নববধূকে আরো সস্নেহে হৃদয়ে গ্রহণ করলেন। হৃদয়ে পুনর্বার আঘাত পেলেও, শচী তাঁর পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণে আদৌ বাধা দেননি। পুত্রের ঈশ্বরলাভের পবিত্র শুভ বাসনাকে তিনি মনেপ্রাণে সমর্থন করেছিলেন। বিবেকানন্দ-জননী ভুবনেশ্বরী ও চৈতন্য-জননী শচীর পুত্রস্নেহের কথা ভাবলে একটি রবীন্দ্র-পংক্তি মনে আসে, তা হলো— তোমার জন্য, আমার মনে যে ভাল-টি বাস করে, তা-ই ভালবাসা। সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধতা নয়, স্নেহের পাত্রের জন্য শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনাই এখানে মুখ্য।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর পূর্বাশ্রমের পরিজনদের দর্শন নিষেধ। তাই সন্ন্যাস জীবনে ‘চৈতন্য’ নাম গ্রহণ করে নিমাই আর গৃহে যাননি। শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে শচী একবার গিয়েছিলেন। নিমাইকে স্বহস্তে রন্ধন করে খাইয়েছিলেন। শচীরই ইচ্ছায় নিমাই জগন্নাথধাম অর্থাৎ নীলাচলে বসবাস করতে থাকেন। সে সময় অনুচর জগদানন্দের হাত দিয়ে তিনি গৃহে জগন্নাথদেবের প্রসাদ ও প্রসাদী নববস্ত্র পাঠাতেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য তিনি পরিত্যক্ত পাদুকা রেখে এসেছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সারাজীবন সেই পাদুকা-জোড়া নিষ্ঠাভরে পূজা করেছিলেন। দেশের ও দশের জন্য স্বীয় সন্তানকে উৎসর্গ করতে যে সুমহান ত্যাগের পরীক্ষা দিতে হয়, শচীদেবী সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

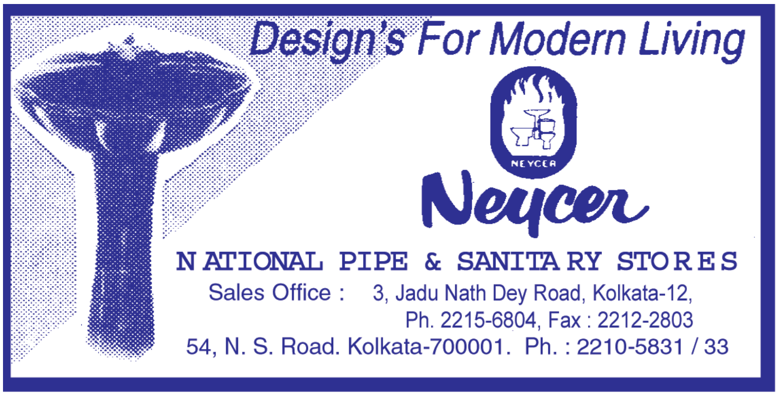

বৈদিক গণিত

প্রাণতোষ বর্ধন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

51-- 59 (পর্যন্ত সংখ্যার বর্গফল নির্ণয়) একই সংখ্যার দুইবার গুণনকে বলে বর্গ, ধরা যাক 57 এর বর্গ নির্ণয় করতে হবে।

57×57=3249.

অতি সহজেই বৈদিক পদ্ধতিতে উত্তর নির্ণয় করা যায়। এখানে দশকের অঙ্ক আছে (5) উভয় ক্ষেত্রে,

অতএব 5×5=25-এর সঙ্গে এককের অঙ্ক (7) যোগ করলে পাওয়া যায় =(25×7)=32 এবং এককের বর্গ করলে পাওয়া যায় =(7×7)=49.

অর্থাৎ বর্গফল হবে =3249.

এই ভাবে অতি সহজেই নির্ণয় করতে পারা যায়—

52 × 52   58 × 58,   59 × 59,   57 × 57

51 × 51   53 × 53,54 × 54,   56 × 56.

'ঊর্ধ্বতির্য্যগভ্যাম্' সূত্রানুসারে

'ঊর্ধ্বতির্য্যগভ্যাম্' শব্দটির অর্থ হলো উভয় দিকে উপরে-নীচে, ও কোনাকুনি। ধরা যাক 47×83 গুণফল নির্ণয় করতে হবে। সূত্রটি হলো = (দ × দ + দ × এ + দ × এ + একক)

```
         47
 . .     83
       -----
 . .   3281
         62
       -----
       3901
```

এক্ষেত্রে প্রথমে 4×8 = 32 বসানো হলো। তারপর কোনাকুনি 7 × 8 এবং 3 × 4 এর যোগফল = 68 বসানো হলো নীচেও উপরে অর্থাৎ 2 -এর তলায় 6 বসানো হলো, 8 অঙ্কটি বসানো হলো (2) অঙ্কের পাশে বসানো হলো। তারপর (7 × 3) = 21 সংখ্যাটির দশক অঙ্ক (2) বসানো হলো 8-এর নীচে। (1) অঙ্কটি বসানো হলো 8-এর পাশে। এরপর যোগ করলে পাই =3901. (উত্তর)

এই ভাবে অতি সহজে তিন সংখ্যার গুণফল করা যাবে সূত্রটি চিহ্ন দিয়ে দেখানো হলো।

প্রথম ধাপ—

দ্বিতীয় ধাপ— (কোনাকুনি গুণ করে যোগফল বসানো হলো।

তৃতীয় ধাপ— (কোনাকুনি ও মধ্য অঙ্কের গুণফল নির্ণয় করে বসানো।

চতুর্থ ধাপ— (এ×5+দ×এ)

পঞ্চম ধাপ—(এ×একক)

```
   1 2 3
 × 2 1 1
 ---------
 2 5 9 5 3
```

এই ভাবে অতি দ্রুত গুণফল নির্ণয় করতে পারা যায়। অভ্যাসের মাধ্যমে মুখে মুখে উত্তর নির্ণয় করতে পারা যায়।

(সমাপ্ত)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

নবাঙ্কুর

ছোটোদের সংস্থা এবং সুবীর

কৌশিক গুহ

ছোটোদের জন্যে তৈরি সংস্থার পরিচয়টা স্পষ্ট সংক্ষিপ্ত সহজ হওয়া দরকার— এই মতটা বাসুদেব গুপ্ত বারবার জানালেও পবন দত্ত মানতে চায়নি। তার সব কিছুর মধ্যে ভাবসম্প্রসারণের ব্যাপারটা থেকে যায়। খেলিয়ে বলা যে সবসময় খাপ খায় না— এটা তাকে বোঝানো যায় না। অসুবিধে হলো, বাসুদেব অনেকরকম কাজ করতে পারলেও লেখালিখি তার আসে না। পবন ওই কাজটা পারে, তবে অকারণে বাক্যবিস্তার সকলে ভালো চোখে দেখে না। বাসুদেব বলে, ‘পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছো। ঝাড়লে একটাও দানা বেরোবে না। অমন লেখার মানে কি! নিজে পড়ার জন্যে লিখতে চাইলে ডায়েরিতে লেখো মনের আনন্দে।’ মাঝে মাঝেই সরাসরি ওইভাবে কিছু কঠিন বাক্য শুনিয়ে দেয় পবনকে। হজম করা ছাড়া উপায় থাকে না তার। কারণ সে জানে ছোটোদের সংস্থায় দলে ভারী বাসুদেব। তার কথায় কাজ হবে সহজে, পবনের কথায় হবে না। বাসুদেব লম্বা, চটপটে, বেতের মতো সোজা চেহারা। পবন লম্বা হলেও বেজায় মোটা, ধীরে সুস্থে তার চলাফেরা। সবসময় নিজের কথা ভাবে। বাসুদেব আর পবনের মধ্যে এসব কারণেই অনেকটা তফাত। বাসুদেবের কাছে ছোটোরা সরাসরি গিয়ে যা খুশি বলতে পারে। পবনের কাছে কেউ ঘেঁষতেই চায় না। ঠিক হলো সুবীর মিত্র একটা খসড়া তৈরি করবে। সেটার ভিত্তিতেই মূল লেখাটা হবে। সুবীরের চিন্তা ভাবনা পরিষ্কার।

সুবীরের সামনে কয়েকটা প্রশ্ন রইল। সুবীর নিজেই সাজিয়ে নিলো। একজন বাইরের জিজ্ঞাসুর মনে কি কি প্রশ্ন জাগতে পারে। তার জবাব সংস্থার পক্ষ থেকে কেমন হবে। ছোটোদের সংস্থা কবে প্রতিষ্ঠিত? আরও তো পাঁচটা সংস্থা রয়েছে, নতুন একটা কেন? উদ্দেশ্য কি? কাজ হচ্ছে কাদের নিয়ে? কি কি কাজ? সাংগঠনিক কাজ কীভাবে সাজানো হচ্ছে? কোন্ জায়গায় কোন সময়ে কাজ চলছে? টাকা পয়সা আসছে কোথা থেকে? অন্যান্য ছোটোদের সংস্থার সঙ্গে তফাত কোথায়? মোটামুটি এই কটা প্রশ্ন সুবীরের মনে এলো।

পঁচিশ বছর আগে সে তার দুই কন্যাকে নিয়ে এসেছিল এক অভিভাবক হিসেবে। পৌলমী আর পল্লবীর বয়স তখন সাত, পাঁচ।

সেসময় কিছু প্রশ্ন সুবীরের মনে এসেছিল। জবাবগুলো পাওয়া গিয়েছিল বাসুদেবের কাছে। সুবীর আর নমিতা মেয়েদের ওখানে ভর্তি করে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। মেয়েরা নামকরা স্কুলে পড়ে। ওখানে শিখবে শনিবার বিকেলে আর রবিবার সকালে নাচগান আবৃত্তি নাটক আঁকা হাতের কাজ। অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে। যেন চাঁদের হাট। সুবীরের খুব ভালো লেগেছিল। তার মেয়েরা তো প্রথমদিনেই মেতে যায়। ছোটোদের সংস্থার বয়স তখন দশ বছর। অভিভাবক হিসেবে অচেনা সংস্থার সঙ্গে পরিচয়ের পর মনে হয়েছিল, তার ছোটোবেলায় ওইরকম কোনো সংস্থা ধারেকাছে কেন ছিল না! দুই কন্যা তো নিজেদের সংস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যে স্কুলে পড়ে তার জন্যেও গর্ববোধ করে। যেখানে সপ্তাহের দুদিন মন স্বাধীনভাবে যা খুশি করতে পারে সেখানে বিশেষ টান তো থাকবেই। যারা ছোটোদের সংস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই খুব খোলা মনের। শুধু একটু বেশি গম্ভীর থাকা পছন্দ করে পবন দত্ত। সেজন্যে বাসুদেবের সঙ্গে বিরোধ। দুজনে আবার পুরনো বন্ধু।

পৌলমী পল্লবী ছোটোদের সংস্থার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে লাগল। ওদিকে স্কুলের পড়াশোনাও চলেছে পুরোদমে। বাড়িতে বাবা-মাকে তারা বন্ধুর মতো পেয়েছিল। ছোটদের সংস্থার বাসুকাকুও তো বন্ধুর মতোই। সকলের কাছে একরকম। একদিন বাসুদেব প্রস্তাব দিল সুবীরকে, ‘তুমি যোগ দাও এখানে।’ সুবীর এর আগে সংস্থার জন্যে অনেকরকম পরামর্শ দিয়েছে। আর্থিক সাহায্য করেছে। সুবীর পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট। দিনে চাকরি নামকরা সংস্থায়। সন্ধেবেলা একটা কলেজে পড়ানো অ্যাকাউন্টেনসি। বাসুদেবের কথায় যোগ দিল ছোটোদের সংস্থায়। অভিভাবক থেকে পরিচালন সমিতিতে। সুবীরের মনের মধ্যে একটার পর একটা ছবি ভেসে ওঠে। পঁচিশ বছর কম তো নয়। পৌলমী পল্লবীরা নিয়ম মতো ছোটোদের সংস্থায় ছিল চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপরেও তাদের কাছে বড় আপন ওই সংস্থা। পৌলমী বিদেশে থাকে। পল্লবী রাজধানীতে। দুজনেরই বিয়ে হয়েছে। ফুটফুটে দুটো ছেলে দুজনের। দুজনে চাকরি করে, ঘর সামলায়। আবার নিজেদের এলাকায় ছোটোদের নিয়ে অনুষ্ঠান করে। তারা বলে, ‘ছোটবেলায় যা আমাদের সংস্থায় শিখেছি তার কথা ভুলতে পারবো না সারাজীবন। বড় বর্ণময় সেই দিনগুলো।’ সুবীর- নমিতা মেয়েদের মুখে এসব শুনে খুশি হয়।

লিখতে লিখতে অনেক কথা মনে পড়তে লাগল। লেখাটা শেষ করার পর নমিতাকে পড়াল। নমিতা বলে উঠল, ‘এত গুছিয়ে বাংলা লিখলে তুমি!’ সুবীরের অনেক ইংরেজি লেখা নমিতা পড়েছে। বাংলা কম। আসলে লেখাটার মধ্যে মিশেছিল অন্যরকম আবেগ। সেদিন সন্ধেবেলা লেখাটা মন দিয়ে পড়ে বাসুদেব জড়িয়ে ধরলো সুবীরকে। পবন লেখাটা পড়ে বলল, ‘ভালো লিখেছো। সত্যি বলতে কী, আমি এরকম পারতাম না।’

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

লাইব্রেরিতে ছোটোদের ওঠার সিঁড়ি

ছোটোদের লাইব্রেরি তৈরি করার আগে অমিতাভ অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। যাঁরা ছোটোদের নিয়ে কাজ করেন তাঁদের কাছে জেনেছিলেন শিশু মনস্তত্ত্বের কিছুটা। তাদের পছন্দ অপছন্দ চাহিদা। একই সঙ্গে কথা বলেছিলেন কয়েকজন শিশুর সঙ্গে। লাইব্রেরিতে ছোটোদের বিভাগ তৈরির সময় ঠিক হলো তাদের জন্যে যেসব বইয়ের র‍্যাক তৈরি হবে তা চার ফুটের বেশি উঁচু হবে না। চওড়া হবে। ভালো কাঠ দিয়ে তৈরি করা চাই। খোলা তাক। বই নেবে, তুলে রাখবে। তাদের পড়ার টেবিলগুলো হবে বিভিন্ন আকারের। বসার জায়গাও। দেখেই বোঝা যাবে ওটা ছোটোদের জন্যে বিশেষ যত্নে সাজানো। দুটো বোর্ড থাকবে। একটাতে ছোটোরা নিজেদের আঁকা ছবি আটকে দেবে। আরেকটা বোর্ডে আটকানো থাকবে তাদের লেখা। মাঝে মাঝে পাল্টে যাবে। ওর মধ্যেই থাকবে

ছোটোদের অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা। তারা নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় করতে পারবে। অনুষ্ঠানে অনেক সময় তারাই হবে সভাপতি। বড়োরা নিচে ছোটছোট চেয়ারে বসে শুনবে। তবে হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে আসবেন ছোটোদের প্রিয় লেখক আঁকিয়েরা। লেখা শেখা আঁকা শেখার ব্যবস্থাও হবে। কখনও কখনও নাটক, আবৃত্তি, গান শেখারও আয়োজন করা যেতে পারে। আসলে আনন্দে পাঠ। ভালো লাগার জায়গা তৈরি হয়ে যাবে। যারা ছোটোদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতে পারে তারা ওই বিভাগের দায়িত্বে থাকবে। কাউকে বকাঝকা করা চলবে না।

অমিতাভ ওইভাবে সাজানোর ব্যবস্থা করে ফেললেন। বাড়িতে ছোটোদের ওঠার সিঁড়ির ধাপ একটু উঁচু হয়েছিল। অমিতাভ বললেন, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে, ‘দেখুন ছোটোরা দল বেঁধে হুটোপাটি করে উঠবে নামবে। ওইরকম সিঁড়ি চলবে না।’ ইঞ্জিনিয়ার মন দিয়ে শুনেছিলেন অমিতাভর কথা। তারপর বললেন, ‘স্যার, সরকারি অফিসে ওইরকম ভাবে কেউ যে চিন্তা করেন তা আমি প্রথম দেখলাম। কথা দিচ্ছি, সিঁড়ি নতুনভাবে তৈরি করে দেবো।’

ছোটোদের বিভাগ শুরুর দিন কত শিশু এসেছিল। তাদের প্রত্যেককে উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন অমিতাভ। চিফ ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন নাতনিকে নিয়ে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে জানত না ওই সিঁড়ি কত যত্নে তৈরি হয়েছে। অমিতাভ বলেছিলেন, ‘ছোটোদের ওঠার সিঁড়ি সব জায়গাতেই যত্নে তৈরি করতে হয় সবসময়।’

বইমিত্র

ভারত কথা

শিবাজীর গুরু রামদাস

ছত্রপতি শিবাজীর গুরু ছিলেন রামদাস। তাঁর জন্ম ঔরঙ্গাবাদ জেলার জাম্ব গ্রামে। ১৬০৮ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের একদিন। দুপুরবেলা তাঁর জন্ম। বাবার নাম সূর্যজী। মায়ের নাম রানুবাঈ। তাঁর যখন সাত বছর বয়েস তখন বাবাকে হারান।

রামদাসের বয়স যখন কৈশোর পেরিয়েছে তখন বিদেশিরা মাঝে মাঝেই এদেশ আক্রমণ করছে। সাধারণ মানুষ ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। কখন কীরকম বিপদ আসে কে জানে! উত্তরে মোগলরা এসেছে। দক্ষিণে গোলকুণ্ডা অর্থাৎ এখনকার হায়দরাবাদে কুতুবশাহ, বীজাপুরের সুলতানের অত্যাচার বাড়ছে। ওই সময়ে রামদাস সারা ভারতে জাগরণের জন্যে শাঁখে ফুঁ দিলেন। সমাজকে বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে যে শক্তি ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাও।’

ছোটবেলায় নাম ছিল নারায়ণ। সে সময় ছিলেন খুব বুদ্ধিমান আর চঞ্চল। শরীরকে বলবান করার জন্যে প্রতিদিন দু হাজার বার সূর্য নমস্কার ব্যায়াম করতেন। সওয়া মণ ওজনে ধানের বস্তা উঠিয়ে নেওয়া ছিল খুব সহজ কাজ। পরম ভক্ত ছিলেন হনুমানজীর। শোনা যায় হনুমানজী খুশি হয়ে তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। তখন থেকে তিনি রামদাস। সারাজীবন ব্রহ্মচারী। কারণ ছিল একটা। অল্প বয়সে তাঁরও বিয়ের ব্যবস্থা হয়, তখন তিনি বিবাহ আসর থেকে পালান। পালিয়ে এক অশ্বত্থ গাছের নিচে ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

এরপর নাসিকের কাছে গোদাবরী আর নন্দিনী নদীর সঙ্গম স্থলের কাছে এক গুহাতে বসবাস। সূর্যোদয় থেকে দুপুর পর্যন্ত তিনি নদীর জলে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়েছেন।

বারো বছর পর্যন্ত সাধনার পর বারো বছর তীর্থ পরিক্রমা করেন। সেইসঙ্গে যোগ হয় সৎসঙ্গ সান্নিধ্য। এরপর গ্রামে গ্রামে মঠ স্থাপন করেন। তীর্থযাত্রা শেষে গোদাবরী প্রদক্ষিণ করতে বেরোন। তখন তাঁর সঙ্গে থাকত ধনুর্বাণ। তীর্থযাত্রার সময় তিনি দেখতে পান ভারত কত দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। আকালের জন্যে সাধারণ মানুষের শরীর খুব খারাপ। বিধর্মীরা শাসন ক্ষমতায় থাকায় তারা অনেক জায়গায় দেবমূর্তি ভাঙছে, মন্দির ধ্বংস করছে।

হিন্দুদের বাধ্য করা হচ্ছে পরধর্ম নিতে। এরকম অবস্থাটা দূর করার জন্যে তিনি শক্তি জাগাবার উদ্যোগ নিলেন। রামজন্মোৎসব ও হনুমানজয়ন্তী উৎসব শুরু করলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুললেন আত্মবিশ্বাস, প্রেরণা, স্বাতন্ত্র্য ভাবনা এবং অন্যান্য সদ্‌গুণ। দক্ষতা বাড়াবার আগ্রহ সৃষ্টি করলেন। শেখালেন পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে ‘রাম রাম’ বলে অভিবাদন করা। ছত্রপতি শিবাজী মূল প্রেরণা পান গুরু রামদাসের কাছে। তাঁরই নির্দেশে শিবাজী রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হন। তাঁরই পরামর্শে রাজ্যাভিষেক হয় শিবাজীর। শিবাজী গুরুদক্ষিণা হিসেবে সমস্ত রাজ্য ও সম্পত্তি এক দানপত্র লিখে গুরুর ঝুলিতে ফেলে দেন। রামদাস বলেন, ‘তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করবে।’

রামদাস সুন্দর কথা বলতেন। লিখতেনও। তাঁর লেখা কয়েকটি বই আছে। তিনি সন্ত ও সাধুদের আত্মকল্যাণের সাধনার সঙ্গে রাষ্ট্র কল্যাণের জন্যে সক্রিয় থাকতে প্রেরণা দিতেন। রামদাস প্রকৃত অর্থে লোকনায়ক। শিবাজীর সঙ্গে তার শেষবার দেখা হয় সুজানগরে। এর দুমাস বাদে চৈত্র পূর্ণিমার দিনে শিবাজীর জীবনাবসান। এর কিছুদিন বাদে সমর্থ রামদাস ধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করেন।

দেবজিৎ মুখোপাধ্যায় সংকলিত

বিরল প্রতিভার অধিকারিণী তামিল কন্যা বিশালিনী

আঁখি মহাদানী মিশ্র

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'— সত্যিই বিপুল এই পৃথিবীতে কত না বিস্ময়কর প্রতিভা আছে যা আমাদের অজানা। এমনই এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারিণী ১১ বছরের ছোট্ট বিস্ময় বালিকা বিশালিনী, যার ঝুলিতে রয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক বুদ্ধ্যাঙ্ক (I.Q.)।

তামিলনাড়ুর একটি গ্রামের ১১ বছরের মেয়ে বিশালিনী শুধুমাত্র যে ভারতখ্যাত তা নয়, বিশ্ববিখ্যাত তার বুদ্ধ্যাঙ্কের জন্য। যদিও সে বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধ্যাঙ্কের অধিকারিণী তবুও তার 'গিনিস্ বুক অফ রেকর্ডস্'-এ নাম ওঠেনি। কারণ তার বয়স ১৪ বছরের নীচে। এই রেকর্ডস বুকের নিয়মানুসারে ১৪ বছরের কম বয়সীদের বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী হিসাবে নাম ওঠে না।

আর পাঁচটা মেয়ের মতো বিশালিনী বাবা মায়ের আদরে বেড়ে উঠতে থাকে। কার্টুন দেখতেও বেশ ভালোবাসে। কার্টুন দেখলে সবকিছু ভুলে যায়। সাইকেল চালিয়ে, খেলা করে অন্য শিশুদের সঙ্গে সময় কাটায়। তবে সে গড়পড়তা ১১ বছরের মেয়েদের মতো নয়। হাসি, খেলায়, কার্টুন দেখায় মশগুল এই মেয়েটির I.Q. এমনই বিস্ময়কর যেটা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। তার I.Q. ২২৫, যা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, মহা মহা রথীদেরও নেই।

এতদিন পর্যন্ত সর্বাধিক I.Q.-এর রেকর্ড ছিল কিম্-উং-এর যার বুদ্ধ্যাঙ্ক ২১০, আবার এও মনে রাখতে হবে যে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বুদ্ধ্যাঙ্ক ছিল ১৬০।

তামিলনাড়ুর অখ্যাত গ্রামের মেয়ের কৃতিত্ব শুনলে অবাক হতে হয়। মাত্র ১০ বছর বয়সে ওসিজেপি এবং সিসিএনএ (Cisco Certified Network Associate) পরীক্ষায় ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে, যখন অন্যান্য শিশুরা শুধুমাত্র পড়াশুনা ও খেলাধুলায় মশগুল থাকে। এটিও একটি বিশ্বরেকর্ড। কারণ এত কম বয়সে আগে কেউ ৯০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হয়নি। সে আবার মাইক্রোসফ্ট সার্টিফায়েড প্রফেশন্যাল পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ। এতটুকু বয়সে যে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে গেছে বিশালিনী তা অকল্পনীয়। কতদিনের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে আমরা একটি সাফল্যের জায়গায় পৌঁছই। কিন্তু সেই সীমা অল্পেই পার করেছে বিশালিনী। এখন সে নিয়মিত গেস্ট লেক্চারার হিসাবে আমন্ত্রিত হয় ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য। আমন্ত্রিত হয় এমন সব প্রতিষ্ঠানে যেখানে যাওয়ার জন্য কত ব্যক্তি জীবনভর স্বপ্ন দেখে। সে আমন্ত্রিত হয় ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস এবং বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ্ টেক্নোলজিতে।

বিভিন্ন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বিশালিনী নিজের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করতে আগ্রহী। বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ডিগ্রি দেওয়ার জন্য, কিন্তু ছোট্ট বিশালিনীর বাবা কুমার স্বামী যিনি পেশায় ইলেকট্রেশিয়ান তিনি চান না বিশালিনীর শৈশবকে নষ্ট করে দিতে। তিনি চান বিশালিনী শৈশবকে উপভোগ করুক নিজের মতো করে। শৈশব এমন এক মধুর সময় তা চলে গেলে ফিরে আসেবে না কোনোদিন। তাই এই অমূল্য শৈশব যেন পড়াশুনা আর ডিগ্রির চাপে নষ্ট না হয়ে যায় সেই দিকে বিশেষ খেয়াল রেখেছে তার বাবা।

পরে অবশ্য বিশালিনী বিশাখাপত্তনমের চৈতন্য ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনীয়ারিং-এ বি.এ সম্পূর্ণ করে। বর্তমানে সে বিখ্যাত সংস্থা 'ইনফোসিস'-এর টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট রূপে কর্মরত।

মনুষ্যসমাজে এমনই ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভাশালী বহু কুঁড়ি ফোটার অপেক্ষায় রয়েছে। প্রয়োজন শুধু একটু যত্নের, সাহায্যের, ভালোবাসার। তবেই অসংখ্য এমন বিস্ময়কর প্রতিভার ফুলে ভরে উঠবে মনুষ্য কানন, বাড়বে কন্যাসন্তানের কদর।

অতিথি কলম

লাল পার্টি তাদের যে নামেই ডাকা হোক না কেন তাদের মানসিকতা একই

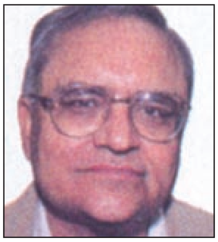

বলবীর পুঞ্জ

যেদিন সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হলো যে, কেরলে কোঝিকোড় জেলার দায়রা আদালত ২০১২ সালের বিদ্রোহী কমিউনিস্ট নেতার হত্যার দায়ে তিনজন কমিউনিস্ট নেতা সহ অন্য আটজন ভাড়াটে খুনিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে আর ঠিক সেইদিনই উত্তর-কোরীয় কমিউনিস্ট নেতা কিম লঙ-উন তাঁর কাকা জ্যাঙ সঙ ঠেকের পরিবারের সকলকে হত্যা করে। কারণ বৃদ্ধ জ্যাঙ কিছুদিন আগেই শাসক কিম লঙেকে তখত থেকে উৎখাত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন।

কেরলের কমিউনিস্ট নেতারা যাঁরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন তাঁরা ২০০৯ সালে বিদ্রোহী নেতা টি পি চন্দ্রশেখরনকে হত্যা করেছিলেন। চন্দ্রশেখরনের অপরাধ ছিল যে, তিনি নতুন একটি দল গঠন করেছিলেন। আদালতের বক্তব্য হলো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যই চন্দ্রশেখরনের প্রাণ গেল। তাঁকে হত্যার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পরেই ভাড়াটে খুনি দিয়ে কোঝিকোড়ে তাঁর জন্মভিটেতেই প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়।

> **কমিউনিস্টরা যেখানে যেখানে শক্তিধর তা সে ক্ষমতায় থাকুক বা ক্ষমতার বাইরে, তারা হিংসা ছড়িয়েছে, হত্যা করেছে, তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বর্বরতা চালিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তাদের ৩৪ বছর রাজত্বকালে প্রতিদিনই এমন ঘটনা ঘটত।**

কমিউনিস্টরা সে যে দেশেরই হোক— রাশিয়া, জার্মানি, চীন কিংবা কম্বোডিয়া, তারা সর্বদাই বিদ্রোহীদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। গত ৭৫ বছরের ইতিহাস এর সাক্ষী। জোসেফ স্ট্যালিন গত শতকের তিরিশের দশকে বলশেভিক পার্টির তাঁর সমস্ত সহকর্মীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেন স্রেফ দলবিরোধী কাজকর্মের অভিযোগে। সবচেয়ে খারাপ হলো চীন— সেদেশের মাও জে দং দেশের কৃষকদের গণহত্যা চালান, একথা অকপটে স্বীকার করে নেয় মাও-য়ের উত্তরসূরিরা। পূর্বতন পূর্ব-জার্মানির কমিউনিস্ট সরকার তার নাগরিকদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে চরবৃত্তিতে কাজে লাগায়। কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের পর লোকসমক্ষে আসে যে, পরিবারের সদস্যরাই একে অপরের বিরুদ্ধে চরবৃত্তিতে নিযুক্ত।

এসবের মধ্যে জঘন্যতম ঘটনা ঘটেছে কম্বোডিয়ায়। সেখানকার কেমার রগ সরকার কুড়ি লক্ষ মানুষকে হত্যা করে, ইতিহাসে যা 'কিলিং ফিল্ড' নামে কুখ্যাত। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান অনুযায়ী এই 'কিলিং ফিল্ড-এ' কম্বোডিয়া সরকার হিটলারের মতোই বর্বরতা দেখিয়েছে। হিটলার যেমন ইহুদি হত্যায় গ্যাস-চেম্বার ব্যবহার করেছিলেন।

ভারতের কেরলে কমিউনিস্টরা এতদিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়নি। একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-ই দুর্দম প্রচার চালায় কমিউনিস্ট ভাবধারার বিরুদ্ধে সে রাজ্যের মানুষের রাজনৈতিক সহায়তায়। কমিউনিস্টরা তার জবাব দেয় আর এস এস কর্মীদের ব্যক্তিগত ভাবে বা কোথায়ও কোথায়ও দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে।

বর্বরতাই হলো ওদের সাধারণ অস্ত্র। চন্দ্রশেখরনের হত্যার রায়ই বলে যে, কমিউনিস্টরা ১৯৯৯ সালে বিজেপি-র শিক্ষক নেতা কে টি জয়কৃষ্ণনকে শ্রেণীকক্ষে ঢুকে ছাত্রদের সামনেই হত্যা করে। দু'টি হত্যাকাণ্ডই ব্যক্তিগত আক্রোশ নয় বরং রাজনৈতিক আক্রোশ চরিতার্থ করতেই করা হয়। এই তত্ত্বটি উঠে আসে আদালতের রায় থেকে। বিচারকের কথায়, চন্দ্রশেখরনের হত্যা অমানবিক, বর্বরোচিত এবং মানবিকতার বিরুদ্ধে।

স্পষ্টত কেরলের কমিউনিস্টের শীর্ষ নেতা মি. পিনারাই বিজয়ন এই রায়কে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে আদালত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ অগ্রাহ্য করেছে। কেরল পুলিশ ৬৮৩ রকমের সাক্ষ্যপ্রমাণসহ ২৮৩ জন সাক্ষীকে আদালতে পেশ করেন। যদিও মি. বিজয়নের

সহকর্মী ও বর্তমানে একঘরে নেতা এবং কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভি. এস অচ্যুতানন্দন এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। এমনকী তিনি নিহত নেতার স্ত্রী রিমা যিনি এই হত্যার বিরুদ্ধে আলোড়ন তুলেছেন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে চেয়েছেন।

কমিউনিস্টরা যেখানে যেখানে শক্তিধর তা সে ক্ষমতায় থাকুক বা ক্ষমতার বাইরে, তারা হিংসা ছড়িয়েছে, হত্যা করেছে, তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বর্বরতা চালিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তাদের ৩৪ বছর রাজত্বকালে প্রতিদিনই এমন ঘটনা ঘটত। এমনকী প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে মাওবাদী পুষ্পকমল দহল ওরফে প্রচণ্ড বহুদিন ধরে সেখানে হত্যালীলা চালিয়েছেন।

কিন্তু ক্ষমতা দখলের কিছুদিন বাদেই নেপালীরা যখন বুঝতে পারে যে, তাদের ভুল হয়েছে তখনই প্রচণ্ড-র দলের মধ্যে ভাঙন শুরু হয়। নেপালীদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাঙালি অভিজ্ঞতার সাযুজ্য রয়েছে এই অর্থে যে, পশ্চিমবঙ্গেও জনপ্রিয়তা কমাতে, ক্ষমতা হারাবার ভয়ে হিংসার সাহায্য নিয়েছে কমিউনিস্টরা তাদের বিরোধী শক্তির কণ্ঠরোধ করতে।

পশ্চিমবঙ্গে এই অবস্থার পরিবর্তন হলো যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এলেন। তিনি বামেদের বিরুদ্ধে আপোশহীন সংগ্রাম চালান। সাধারণ মানুষ তাঁর পিছনে দাঁড়ানোর ফলে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কমিউনিস্টদের উৎখাত করলেন।

২০০৯ সালের সংসদীয় নির্বাচনেও বামপন্থীরা পরাজয়ের সম্মুখীন হলো। কিন্তু সংসদে তাদের সীমিত উপস্থিতি সত্ত্বেও কট্টরবাদীরা দেশজুড়ে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে। এরা কেবল নিরাপত্তাকর্মীদের খুন করেই ক্ষান্ত হলো না, সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষদেরও খুন করছে।

মাওবাদী হামলার ঘটনা ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত। ছত্তিশগড়ে সম্প্রতি বিজাপুরের এক সাংবাদিক সাই রেড্ডিকে হত্যা করে মাওবাদীরা ২০১৩-র ডিসেম্বরে। এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই হত্যালীলায় মাওবাদীরা তো মোটেই অনুতপ্ত নয়, উল্টে তারা রেড্ডির হত্যার সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীরা যুক্ত--- এমন নির্জলা মিথ্যাও প্রচার করতে থাকে।

এমন নয় যে, দেশীয় কমিউনিস্টরা বুঝতে পারছে না দুনিয়া জুড়ে তারা ব্যাকফুটে। এমনকী চীনেও কমিউনিস্টরা বিদায়লগ্নে, সে দেশের প্রেসিডেন্ট জি জিং পিং বেজিং-এর রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পেও দেশী-বিদেশী পুঁজিকে স্বাগত জানিয়েছেন। চীনের কমিউনিস্টরা 'রেড কার্পেট' গুটিয়ে নিচ্ছে ধনতন্ত্রের জন্য। উদাহরণরূপে বৃটেনের থেকে অনেক বেশি ধনী বর্তমানে চীনে রয়েছে।

মার্কস, লেনিন, মাও— অনুগামীদের হত্যা তাদের মনে কোনোরকম দাগ কাটে না। বিপ্লবের নামে হত্যালীলাকে এরা সঠিক বলে মনে করে। বহুকাল ধরে রাশিয়া, চীন, পূর্ব জার্মানি, কম্বোডিয়ায় যা ঘটে এসেছে, আমাদের দুর্ভাগ্য তারই পুর্বানুবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি কেরল, ছত্তিশগড়ে বস্তার এবং দেশের অন্য প্রান্তে।

নেপালে যেমন কমিউনিস্ট আন্দোলন ত্রিধারায় বিভক্ত, তবুও এরা রাজশাসনকে পাল্টে দিতে পারে, ঠিক তেমনি কেরলে বিভাজন সত্ত্বেও এরা ক্ষমতার অলিন্দে ঘুরপাক খায় যুগ-যুগান্ত ধরে। কমিউনিস্ট তত্ত্বকে অসাড় করতে চন্দ্রশেখরনের পৃথক দল গড়ার চেষ্টা প্রতিহত করতে তাঁকে খুন হতে হয়, কিংবা কেরলবাসীর মনে আজও বিজেপি নেতা জয়কৃষ্ণনের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ ও হত্যা জ্বলজ্বল করেছে।

সিপিএম রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ায় বস্তারের মাওবাদীদের থেকে একটু ভিন্নমত পোষণ করলেও সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করে যা তাদের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত জনসমক্ষে প্রকাশ করে থাকেন।

(লেখক একজন স্তম্ভলেখক এবং বিজেপি প্রবক্তা)

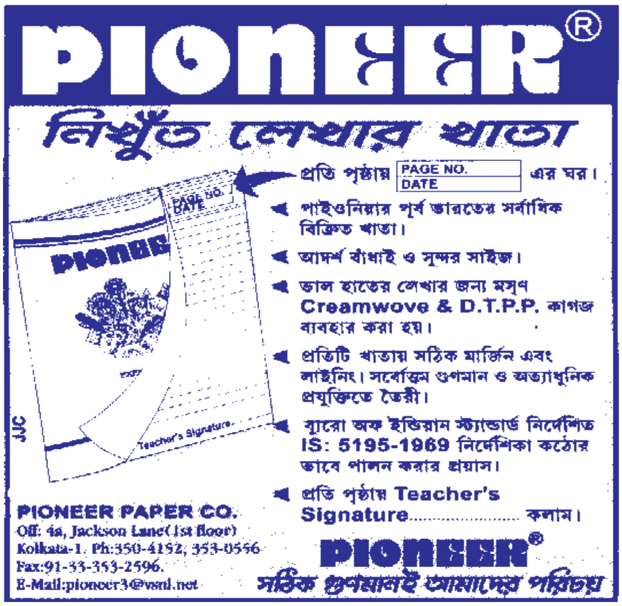

টিপির নিচে বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ধার

বিশেষ প্রতিনিধি।। ১৮৭২ সালে এ এম ব্রডলে যখন নালন্দার শাসক তখন তিনি 'তিলাস ঐক্য' বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা লেখেন। যেখানে বিদ্যাচর্চা হোত একসময়। ইংরেজ ফৌজি অফিসার ও পুরাতাত্ত্বিক স্যার আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম ওই জায়গা দু'বার ঘুরে আসেন। ১৯৭২ এবং ১৮৭৮। তিনি সেখানে পাওয়া শিলালিপি সম্পর্কে লেখেন— তেলিয়াডহক জায়গাটায় সাতটা বৌদ্ধ মহাবিহার ছিল, যার কথা ইউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতেও রয়েছে। ওখান থেকে পাওয়া গেছে বারো হাতের এক বুদ্ধমূর্তি। অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ। যা এখন রয়েছে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে। তবে বেশি জানা যায় পাল যুগের ভাস্কর্যের কথা। যা তেলহারা-তে পাওয়া গিয়েছিল। এদেশে নেই। রয়েছে জুরিকের রিটবার্গ সংগ্রহশালায়।

জায়গাটার নাম তেলহারা। বিভিন্নজনের লেখায় নামটি পাওয়া গেছে নানান রূপে। এখন বলা হচ্ছে তেলহারা। না, তেলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। মাটি খোঁড়ার পর সেখান থেকে মিলেছে এমন অনেক জিনিস যা পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অমূল্য। ভারত- ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপাদান।

তেলহারা জায়গাটা নালন্দা থেকে ৩৩ কিলোমিটার দূরে। জায়গাটা কিছুকাল আগেও ছিল মাটির ঢিপি। নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় আবিষ্কারের পর খোঁড়াখুঁড়ির কাজ যখন চলেছিল তখন তেলহারার দিকে নজর পড়েনি। এখন

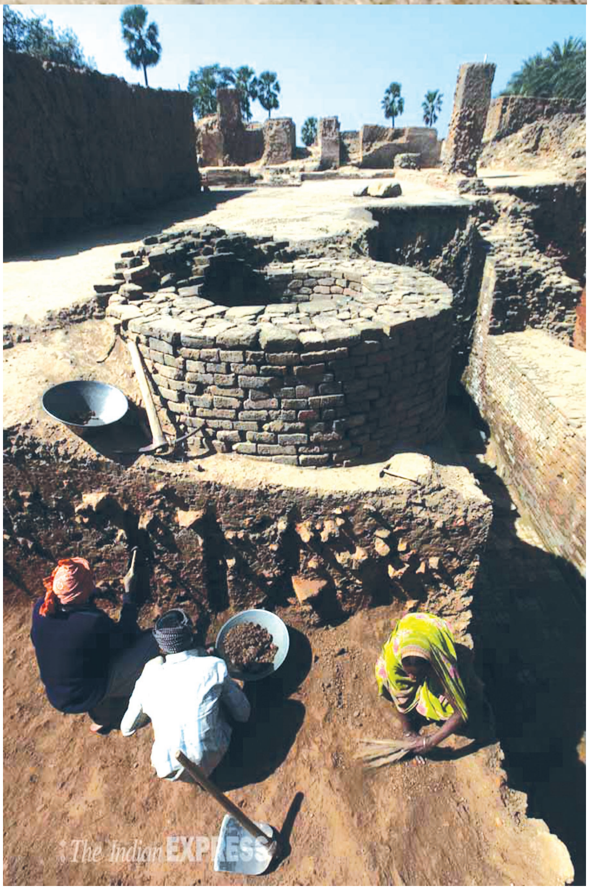

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওই জায়গায় খনন কাজ আরো আগে শুরু করা উচিত ছিল। কারণ জায়গাটা ছিল নালন্দার থেকেও বিখ্যাত।

তেলহারার মাটির ঢিপির নিচে যে ইতিহাস চাপা পড়ে আছে, তা জানার তাগিদ আসতে সময় লেগেছিল। তেলহারা পঞ্চায়েতের প্রধান অবদেশ গুপ্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম খনন কাজ শুরু করায় যাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি বলেছেন, আমরা সকলেই জানি তেলহারা একসময় বিখ্যাত স্থান ছিল শিক্ষার। কিন্তু তা প্রমাণ করার জন্যে কেউ কোনোরকম উদ্যোগ নেননি। আমি ১৯৯৫ সালে কংগ্রেস সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম ওই জায়গায় খনন কাজ শুরুর জন্যে। কিন্তু কোনো রকম আশ্বাস মেলেনি। তারপর যখন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতিশ কুমার ২০০৭ সালে ওই জায়গা দেখতে গেলেন তখন তাঁকে আবার আবেদন জানালাম। গ্রামের মানুষ খুশি ছিল না আমার উপর। তারা ভেবেছিল আমি আরও বড়রকম পাকাপাকি কোনো বন্দোবস্তের দাবি জানাবো যা স্তূপ খোঁড়ার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তবে শেষ হাসিটা গ্রামের মুখিয়ারই। এখন আশপাশের গ্রামবাসীরা বড়মুখ করে তেলহারার কথা বলছে নালন্দা ও রাজগিরের পাশাপাশি। তারা আশা করছে সেখানে তার পরে কাজের আরো বড় সুযোগ আসবে। এক গ্রামবাসী বলেছেন, আমরা আশা করছি খোঁড়াখুড়ির কাজ শেষ হওয়ার পর জায়গাটা সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে। আর নালন্দার মতোই পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে। ওই জায়গায় অস্থায়ীভাবে কাজ পেয়েছে ৭০ জন।' গ্রামবাসীরা এখন বুঝেছে ওটা পড়ো জমির স্তূপ নয়। খুব দরকারি জায়গা।

তিলহারায় খনন কাজ শুরুর পর থেকে অনেক পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আশপাশের ওইরকম ছ'টা স্তূপ রয়েছে। সেগুলোর নিচেও হয়তো চাপা পড়ে আছে অনেক ইতিহাস। তার মধ্যে একটার আংশিক খনন কাজ হয়েছে। বাকি পাঁচটা যেমন ছিল তেমনই রয়েছে।

বিহার সরকারের শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষণ বিভাগের প্রধান অতুল কুমার ভার্মা বলেছেন, “খনন কাজ শুরুর সময় থেকে বলা হয়েছে নালন্দার সমসাময়িক তেলহারা। সেখানে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। নালন্দা থেকে পাঠ নেওয়া স্নাতকরা উচ্চতর শিক্ষার জন্যে সেখানে আসত। আমাদের কাছে এটা গৌরবের ব্যাপার, নালন্দার পর ওইরকম একটা বড় জায়গার সন্ধান মিলেছে।”

জায়গাটা সম্পর্কে কৌতূহল জেগেছে অনেকেরই। নামী লোকজন সেখানে গেছেন। অর্মত্য সেনও ঘুরে এসেছেন। অমর্ত্য সেন সেখানকার পরিদর্শক-খাতায় লিখেছেন, 'কি চমৎকার জায়গা! সত্যি সত্যিই রোমাঞ্চকর। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে খনন ও গবেষণার কাজ চলেছে।'

তেলহারা শিবিরের প্রধান নন্দগোপাল বলেছেন, 'আমরা যে জায়গাটা খুঁড়িছি সেটা হলো মূল জায়গাটার চত্বর। আরও অনেক কিছু

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. প্রকাশনের স্থান : ২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬,
২. প্রকাশনের সময় : সাপ্তাহিক। **৩. মুদ্রকের নাম :** শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ৫/২৪, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা-৪১।
৪. প্রকাশকের নাম : শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ৫/২৪, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা-৪১।
৫. সম্পাদকের নাম : শ্রী বিজয় আঢ্য। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২৭/১, বি, বিধান সরণি, কলকাতা -৬। ৬. **মালিকানা :** স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট। **ঠিকানা :** ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬।

ট্রাস্টের সদস্যবৃন্দ :
অধ্যাপক অমল কুমার বসু, ২৬, বিধান সরণি, কলকাতা -৬।
শ্রী যুগলকিশোর জৈথলিয়া, ১৬১/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -৭।
শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত, ৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা -৬।
শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, ৬৪, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা - ৬৭।
শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫/২৪, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা -৪১।
শ্রী সত্যনারায়ণ মজুমদার, পুড়াটুলী, মালদা।
শ্রী অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, ৯৫বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭৩।
শ্রী দেবাশিস লাহিড়ী, ২/৫, সর্ট রোড, দুর্গাপুর -৪।
শ্রী প্রদীপ কুমার দে, ১০/৩৮, বিজয়গড়, পোঃ যাদবপুর, কলকাতা-৩২।

আমি শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর

শ্রীরণেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তারিখ ঃ ১০.০৩.২০১৪

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছি আমরা।' কতকাল ধরে তেলহারার সোনালি-বাদামি মাটির নিচে চাপা পড়েছিল ইতিহাস। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ওই জায়গায় ঘুরে যে বিবরণ লিখেছেন সরকারের কাছে তা গুরুত্ব পায়নি। আজ সেখানে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলেছে। এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাকেন্দ্র ছিল সাতটা মহাবিহার সমেত।

বিহার সরকার বলেছে, তেলহারা প্রকল্প হলো নালন্দা ও বিক্রমশীলার পর সব থেকে বড় খনন কর্ম। ২০০৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে খোঁড়ার কাজ। ৩০টি সারিতে খোঁড়ার পর পাওয়া গেছে এক হাজারের বেশি পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী। লাল রঙা বেলেপাথর, কালো পাথর, নীল পাথরে তৈরি বুদ্ধ মূর্তি এবং কিছু হিন্দু মূর্তি পাওয়া গেছে। ছোটমাপের ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির কাজও পাওয়া গেছে। অনুমান করা করা হচ্ছে এগুলো গুপ্ত যুগ (৩২০-৫৫০ খৃস্টাব্দ) বা পাল যুগের (৭৫০- ১১৭৪ খৃস্টাব্দ)। ২.৬ একর জুড়ে যে স্তূপের অবস্থান সেখানে বাড়িঘর ছিল তিনতলা গঠনের।

মাটির নিচে থেকে আবিষ্কৃত ইতিহাস।

প্রার্থনা ঘর ছাড়া ছিল উপাসনা স্থল, যেখানে এক হাজার সন্ন্যাসী অথবা বৌদ্ধধর্মের মহাযান শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে বসার ব্যবস্থা ছিল।

ভারত সরকারের পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষণ বিভাগের প্রধান বি এস ভার্মা ১৯৭১ ও ৮১ সালে প্রাচীন বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খনন কাজ তত্ত্বাবধান করেছেন। তিনি বলেছেন, তেলহারা বা তিলাধক জায়গাটার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হয়তো আছে বিক্রমশীলার থেকে। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ অনুযায়ী ওখানে এক বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিহার রয়েছে নালন্দার মতো।

বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান ছড়িয়ে আছে তার বিবরণ নানান বইয়ে লেখা হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, মগধরাজ বিম্বিসারের কোনো উত্তরপুরুষ এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন।

তেলহারার অবস্থান বিহারের নালন্দা জেলার হিলসা মহকুমায়। তুর্কি আক্রমণকারী বখতিয়ার খিলজি যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে তখন বাদ পড়েনি তিলহারার মহাবিহার। খোঁড়ার পর মিলেছে কয়েক মিটার পুরু ছাইয়ের নিচে পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী।

তেলহারার মাটির নীচে থেকে আরও কত রোমাঞ্চকর উপাদান উঠে আসে, ইতিহাস ও পুরাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসুরা এখন রয়েছেন তারই প্রতীক্ষায়।

দেশ রক্ষার জন্য সহিংস হওয়া বাধ্যতামূলক

অমলেশ মিশ্র

গান্ধীজীর অহিংসাতত্ত্ব ক্ষত্রিয়ের অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে। গান্ধীজীর অহিংসা সন্ন্যাসী ও সন্তদের ক্ষেত্রে চলতে পারে। হিন্দুদের তিনি অহিংস থাকতে বলেছিলেন যদিও নিজ অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছিলেন যে তার আমলে কোনো আন্দোলনই অহিংস ছিল না। মানুষের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে তাদের প্রসঙ্গে অহিংস থাকার কথা সাধারণ মানুষ মানেননি। ভারতের মাটিতে গান্ধীজীকে কখনও ইংরেজ হিংসার মুখোমুখি হতে হয়নি। একথা বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে— ভারতের সহিংস বিপ্লবী ও অহিংস বিপ্লবীদের মধ্যে সহিংসদের ইংরেজরা অনেক বেশি ভয় পেত। তাদের ভারত ত্যাগের পিছনে এই সহিংসরা— সুভাষবোসের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, বোম্বাই নৌবিদ্রোহ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যদের ব্যাপক মৃত্যু, বিরাট এমনকী নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল।

গান্ধীজী হিন্দুদের সবসময়ই অহিংস থাকতে বলতেন। এই হিন্দুরাই ছিল ইংরাজ তাড়ানো আন্দোলনের মূল শক্তি। কিন্তু ইংরেজ- শাসক ও মুসলিম লীগকে তিনি কখনও অহিংস থাকতে বলেননি। বললেও তারা গান্ধীজীর কথায় কর্ণপাত করত না। আর হিন্দু কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা প্রায়ই সহিংস হতেন। এর ফলে তাদের বহুবিধ রোমহর্ষক অত্যাচার প্রায় ৫০ বছর ধরে সহ্য করতে হয়েছিল। গান্ধীজী তার আপন বিশ্বাস চাপাতে চেয়েছেন দেশের মানুষের উপর। দেশের মানুষ কী চায় তা গান্ধীজী হিসাবে কখনও আনেননি। যদিও ইংরেজ এবং মুসলিম লীগ কী চায় তিনি তা জানতেন। কিন্তু তাদের চাওয়ার বিরোধিতা করেননি, বরং প্রশ্রয় দিয়েছেন। ফলে দেশভাগও সম্ভব হয়েছে।

রাষ্ট্রকর্মে অহিংসা বুদ্ধদেবও বহু বছর আগে প্রচার করেছিলেন। ভারতের বৌদ্ধরা অহিংসই ছিলেন। এতটাই অহিংস ছিলেন যে যখন তাঁদের নিজধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার বাধ্যতা এল, তখন তাঁরা বিরোধিতা করেননি। তাঁরা ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করেছিলেন।

নিজেকে এবং দেশকে রক্ষা করার জন্য যে সহিংস হওয়া বাধ্যতামূলক একথা গান্ধীজী বুঝতেন না। মহাভারত ও গীতার শিক্ষা তিনি একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হয়েও গ্রহণ করেননি। অধর্ম বিনাশ করতে যে সহিংস হতেই হয় হিন্দুদর্শনের এই শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি একটি অদ্ভুত অহিংসা তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন যা কোনো ভবিষ্যৎ বংশধর গ্রহণ করেনি। কিন্তু সেই তত্ত্ব ভারতবর্ষের সামান্য লাভও করায়নি, অথচ ক্ষতি করেছে অনেক। তিনি তাঁর অহিংসা তত্ত্বকে একটি dogma (আপ্তবাক্য, বিনা প্রশ্নে গ্রহণীয়) হিসাবে প্রচার করলেন। এই dogma-র সঙ্গে দেশের পরম্পরার কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং এই dogma-কে তিনি বিচার, বুদ্ধি ও উদ্ভূত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও বিশ্লেষণ করতে দেননি। 'আমি বলছি— অহিংস হতে হবে, অতএব অহিংস হতেই হবে।' রাজনীতিতে dogma-র স্থান নাই। রাজনীতিতে প্রয়োজন বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ। কখনও অহিংসাই এই ব্যবস্থা হতে পারে আবার কখনও হিংসাও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হতে পারে। গান্ধীজীর অহিংসা তত্ত্ব ইংরেজ ও মুসলিম লীগের প্রভূত উপকার করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে অহিংসা— কাপুরুষতার অন্য নাম হয়েছিল। অহিংসা তত্ত্ব ভারতের কী লাভ করিয়েছে তার মূল্যায়ন প্রয়োজন। আর ক্ষতি যে কতটা করেছে তা সকলেই বুঝতে পেরেছেন। দেশভাগ, মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকসন আর ইংরেজদের লাঠি, গোলা, বারুদ ও কারাগার থেকে, সহস্র সহস্র মানুষের অকারণ মৃত্যু থেকে। গান্ধীজীর dogma ইংরেজ ও মুসলিম লীগকে স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর অত্যাচার করতে উৎসাহিত করেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকসন আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'তোমাকে তোমার শত্রু মেরে ফেলুক তবু তুমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করো না'— এই তত্ত্ব জীব ও উদ্ভিদ জগতের অনুসৃত স্বাভাবিক নীতির বিরুদ্ধে। তৃণও পদদলিত হলে বিঁধবার চেষ্টা করে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এই dogma-র খাতিরে বহু সহস্র নিরস্ত্র আন্দোলনকারী ইংরেজদের বুলেটে প্রাণ দিয়েছেন। যাঁরা যুদ্ধ করে বীরের মতো প্রাণ দিতে পারতেন তাঁরা বিনাযুদ্ধে অকারণ প্রাণ দিয়েছেন। অথচ এই গান্ধীজীই ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় আর ভারতবর্ষে ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ অভিযান করেছেন।

গান্ধীজীর এই অহিংসা dogma ভারতবর্ষের ক্ষাত্র-বীর্যের অপরিমিত ক্ষতি করেছে। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলে গেছে হিন্দু তথা ভারতীয় দর্শনে অবিশ্বাসীদের হাতে এবং দেশ আজও উপযুক্ত ক্ষত্রিয় নেতৃত্বের, ভারতীয় দর্শনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে ভুগছে।

কৃষিকাজের নয়া দিশারি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রতিযোগিতার মানসিকতায় কোনো সংকল্প নিয়ে কাজে লেগে পড়লে কীর্তিমান হওয়া যায়। বিহারের নালন্দা জেলার নদীপাড়ের একটি গ্রাম দরবেশপুরা থেকেই দু'জন কৃষক যুবক কৃষিকাজে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছেন। ধান ও আলু চাষ করে তাঁরা পৃথিবীর মধ্যে রেকর্ড গড়েছেন। সুমন্ত কুমার ও নীতিশ কুমারের জানাই ছিল না যে ধান ও আলু চাষ করে বিশ্ব রেকর্ড গড়া যায়। রাজ্য সরকার তিনতিনবার পরীক্ষা করার পরই ঘোষণা করেছে— সুমন্ত প্রতি হেক্টর জমিতে ২২.৪ কুইন্টাল আর তাঁরই প্রতিবেশী নীতিশ কুমার ১৯.৬ কুইন্টাল ধান ফলাচ্ছেন। গ্রামের অন্যান্য যুবকরাও তাদের জমিতে ১৭ থেকে ১৯ কুইন্টাল প্রতি হেক্টর জমিতে ফলাচ্ছেন। পাশের মানন্দ গ্রামের কৃষক ধনঞ্জয় সিংহও ১৯.৫ কুইন্টাল ধানচাষ করছেন। ওই এলাকার জমিতে আগে প্রতি হেক্টর জমিতে ২.৫ থেকে ৩ কুইন্টাল ধান ফলতো। এখন প্রায় ২০ কুইন্টাল, চারটিখানি কথা! এদিকে নীতিশকুমার আলু চাষও করছেন। আলু তোলার সময় সবাই চমকে ওঠেছে। ৭০০/৮০০ গ্রাম এক একটা আলু। খবর ছড়িয়ে পড়ায় জেলাপ্রশাসন ও কৃষিবিভাগ এসে পৌছয়। সবার সামনে আলু তুলে ওজন করে দেখা গেল প্রতি হেক্টর জমিতে ৭২.৯ টন আলু হয়েছে।

এসব কীভাবে করছেন জিজ্ঞাসা করা হলে সুমন্তকুমার জানালেন— "আমাদের বাপ-দাদারা বলতেন, আমাদের আলু বোম্বাই পর্যন্ত যেত। আর লঙ্কা এক বিঘত পর্যন্ত হোত— একথা শুনে আমার মনে হলো আমরাও তো এরকম করতে পারি। ভাল ফসল ফলিয়ে আমরাও সবার মুখে হাসি ফুটাতে পারি। সেজন্য চাকরি ছেড়ে কিছু চেষ্টাচরিত্র করে ফসল ফলানোর একটা নতুন পদ্ধতির কথা জানতে পারি। তা হলো মেডাগাস্কর বা শ্রীবিধি। কৃষি বিশেষজ্ঞদের থেকে সমস্ত তথ্য নিয়ে পাঁচ বছর আগে যখন শ্রীবিধি পদ্ধতিতে ধান চাষ শুরু করি তো গ্রামের লোকেরা আমাকে পাগল বলতে শুরু করে। কিন্তু সেই বছরই এমন ধান হয়েছিল যে গ্রামের লোকরাও শ্রীপদ্ধতিতে চাষ করতে শুরু করে। ফলে সারা গ্রামে কৃষকের মুখে হাসি ফুটতে শুরু করে। সবার ঘরে ট্রাক্টর থেকে শুরু করে আধুনিক কৃষি-উপকরণ আসতে লাগলো।"

সুমন্ত কিন্তু আরো ভাবছিল। রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তাই জৈব সার তৈরি করে ব্যবহার করা শুরু করে। তাঁর কথায়— "রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বদলে আবর্জনা, গোবর, কেচো থেকে জৈব সার ও গোমূত্র থেকে কীটনাশক ব্যবহার করে আমি অনেক লাভান্বিত হয়েছি।" উল্লেখনীয় যে, ধান চাষ করার পারম্পারিক পদ্ধতিতে ধান রোপার সময় জলভরা জমিতে কাদা করে চার-পাঁচটি চারা একসঙ্গে রোপণ করতে হয়। কিন্তু শ্রীবিধিতে মাটি শুধুমাত্র ভেজা থাকলেই হবে। একটি একটি করে চারা ২৫ সেন্টিমিটার দূরে দূরে লাগাতে হবে। এই পদ্ধতিতে ধানের জমিতে পুজি, শ্রম ও জল তিনটিই কম প্রয়োজন হওয়ায় লাভ অনেক গুণ বেড়ে যায়। পৃথিবীতে এখন ৪০টি দেশ এই পদ্ধতিতে চাষ করছে। খাদ্যের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে প্রধান খাদ্যই ভাত। এজন্য দরবেশপুরা গ্রামের সুমন্ত ও নীতিশ কৃষকদের নতুন পথ দেখিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে চাষ করে শুধুমাত্র নিজের নয়, অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে দেশের কৃষকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari,
Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার, গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063, Mobile : 9733387091

“স্বদেশী-তপস্যা’ ধর্ম কিনা এ বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে কি? অপরে যেন ভারত সম্বন্ধে অকারণ অনর্থক কথা না বলে। ভারতের সকল নরনারীর উপরই দেশের দরিদ্রদের সেবারূপ পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত। নিজধর্ম পালন না করে অপরের ধর্ম অনুসরণ করতে গেলে ধ্বংস অনিবার্য— গীতার এই সাবধান বাণী যেন সকলের মনে থাকে।”

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

অর্শ রোগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

অর্শ বা পাইলস রোগে অনেকেই ভোগেন। অর্শ হলো মলদ্বারের (anus) শ্লৈষ্মিক স্তরের নীচের স্তরে এবং সরলান্ত্রের (Rectum) নিম্নস্তরের শিরাজালের স্ফীতির নাম অর্শ। সংক্ষেপে বলা যায় অর্শ হলো সরলান্ত্রের অথবা মলদ্বারের শিরাস্ফীতি বিশেষ। রোগের অবস্থা অনুসারে অর্শকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে মলত্যাগের সময়ই মলদ্বারের এবং সরলাতন্ত্রের শিরাজালের স্ফীতি বাইরে বেরিয়ে আসে না। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাইরে বেরিয়ে আসে মলত্যাগের সময়। কিন্তু মলত্যাগ শেষে ভেতরে ঢুকে যায় সঙ্গে সঙ্গে। তৃতীয় পর্যায়ে সব সময় বাইরে বেরিয়ে আসে। আমাদের হৃদপিণ্ড থেকে অক্সিজেন-পূর্ণ বিশুদ্ধ রক্ত প্রথমে মোটা পরে সরু ধমনীর সাহায্যে সারা দেহে প্রবাহিত হয়। শেষ পর্যায়ে পৌঁছে রক্ত আর বিশুদ্ধ থাকে না। হয়ে ওঠে কার্বন-ডাই অক্সাইড পূর্ণ। ফুসফুসে পরিশ্রুত হয়ে সেই রক্ত প্রথমে উপশিরা পরে শিরার মাধ্যমে ফিরে আসে হৃদপিণ্ডে। এই নিয়মে সরালান্ত্র ও মলদ্বারের শ্লৈষ্মিক রক্তও হৃদপিণ্ডে পৌঁছতে ঊর্ধ্বগামী হয়। সরলান্ত্র ও মলদ্বারের ঊর্ধ্বগামী অবাধ রক্তস্রোত প্রতিহত হলে শিরায় রক্ত জমে ফুলে ওঠে। নানা কারণে হতে পারে, তবে অতি সাধারণ কারণ কোষ্ঠকাঠিন্য। অন্যান্য কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হৃদপিণ্ড জনিত যেমন কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর। যকৃত জনিত, যেমন সিরোসিস মদ লিভার, গর্ভাবস্থায় মলের বেগ ধারণ ও প্রতিনিয়ত দাঁড়িয়ে কাজ করা, শিরা প্রাচীরের জন্মগত দুর্বলতা, পারিবারিক ইতিহাস প্রভৃতি কারণে শিরা-প্রাচীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক সংকোচন হয় না। ক্রমে উহা একটি থলির মত স্ফীত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। অর্বুদের (Tumar) মত সরলাতন্ত্রের মধ্যে থেকে যায় অথবা মলদ্বারের কাছে ঝুলে পড়ে। অর্শ মটর দানার মতো ছোট অথবা বৃহৎ আখরোটের মতো বড় হতে পারে এবং সংখ্যা এক বা একাধিক থাকতে পারে। মলদ্বারের বাইরে আঙুরগুচ্ছের মতো অর্শ ঝুলতে দেখা যায়। লক্ষণ ভেদে এই রোগের স্তর তিনটি। প্রথম স্তরে মলত্যাগে টাটকা রক্তস্রাব হয়। দ্বিতীয় স্তরের রক্তস্রাব হয় বেশি মাত্রায়, মলত্যাগ কালে মাংসতুল্যস্ফীতি মলদ্বারের চারিপাশে দেখা যায়। যন্ত্রণা থাকে না। থাকলেও সামান্য। তৃতীয়স্তরে রক্তস্রাব হয় না। হলেও সামান্য, কিন্তু থাকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। মলদ্বারের চারপাশে সব সময়ে স্ফীতি লক্ষ্য করা যায়। অর্শের রক্ত মলের সঙ্গে মিশে থাকে। আবার বিন্দু বিন্দু বা পিচকারির মতো স্রাবও হয়। অর্শের পরিণতি নানাভাবে হতে পারে। রক্তাল্পতা, পবন, ভগন্দর, শিরা থ্রম্বোসিস্ এবং মলদ্বারের বাইরে অর্শ নির্গমন ও স্ট্যাঙ্গোলেশন। রোগের পরিণতির কথা মনে রেখে সময় মতো সুচিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক চিকিৎসায় রোগী নরম শয্যায় চিৎ হয়ে শয়ন করবে এবং নিতম্বের নিচে বালিশ যত দূর সম্ভব উঁচু করে রাখতে হবে। যন্ত্রণার লাঘব হবে তাতে। অর্শের বলি বাইরে নির্গত হলে প্রথমে ধুয়ে পরিষ্কার করে বরফের সেঁক দিয়ে তা খানিকটা সংকুচিত করে আঙ্গুলের সাহায্যে ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রসঙ্গে হোমিওপ্যাথিতে লক্ষণ অনুযায়ী যে কোনো ঔষধ দেওয়া যেতে পারে। আমি যে সমস্ত ঔষধগুলি ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি তার কয়েকটি তালিকা নিচে দিলাম।

নাক্স-ভূমিকা : অতিরিক্ত চা, কফি বা মদে আসক্ত, শারীরিক পরিশ্রম হয় না, মলত্যাগের বেগ থাকে কিন্তু মন নিঃসরণ হয় না। প্রায় রক্ত পড়ে, মলদ্বার কুটকুট করে বা চুলকায় প্রভৃতি লক্ষণে নাক্স-ভূমিকা।

হ্যামোসেলিয়া : রক্তার্শে পূর্ব ফলপ্রদ যদি প্রদাহ বর্তমান থাকে। সেই সঙ্গে থাকতে পারে টাটানি ব্যথা। রক্ত স্বল্প বা রক্তহীন মলদ্বার জ্বালা করে বা চুলকায়। কোষ্ঠকাঠিন্য যন্ত্রণায় উপশম ঠাণ্ডা জলে। অর্শ, আঙুরের থোকার মত দেখায় প্রভৃতি লক্ষণে আলাদা। পুরাতন অর্শ মলদ্বারের হুল ফোটানোর মতো বেদনা জ্বালা। কুটকুট করা, সেই সঙ্গে জ্বালা হাতের তালুতে, ব্রহ্মতালুতে ও পায়ের তলাতে— এই সব উপসর্গে সালফার। মলত্যাগের পরে ভীষণ যন্ত্রণা, যন্ত্রণায় রোগী ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়। অর্শ ফোটা ফুলের মতো দেখায়— প্রভৃতি লক্ষণে পিয়োনিয়া দেওয়া যেতে পারে।

কালিনসোনিয়া : দেওয়া হয় মলদ্বারের অস্বস্তিবোধে। কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য, পেট ব্যথা, পেট সবসময় বায়ুতে পূর্ণ, বেশি রক্তস্রাব সেই সব ক্ষেত্রে।

ইস্কুলাস হিপ (Aesculus Hip) : অর্শে রক্ত থাকে না বা স্বল্প থাকে। মলদ্বারের অস্বস্তিবোধ, মলত্যাগের পরে মলদ্বারের জ্বালা, রক্তহীন বা স্বল্প রক্ত, মলদ্বারে আগুনের পোড়ার মত জ্বালা, যে জ্বালা গরম সেঁকে উপশম। সেই সব লক্ষণ হলে আর্সেনিকাম দেওয়া যুক্তিযুক্ত। রক্তস্রাব অল্প কিন্তু মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা, জ্বালার পর মুহূর্তে থেকে উত্তাপে উপশম প্রভৃতি লক্ষণ রাটানিহিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে; যকৃতের দোষজনিত অর্শে কাড়ুয়াস সেরি উপকারে আসে। যকৃতের দোষজনিত অর্শে লাইকোপডিয়াম দেওয়া যেতে পারে। যদি রোগের বৃদ্ধি ঘটে, অপরাহ্নে পেটে বায়ুর প্রকোপ থাকে এবং রোগী গরম ভাত খেতে ভালবাসে, প্রচুর উজ্জ্বল রক্তস্রাব, খিটখিটে লক্ষণে নাইট্রিক অ্যাসিড।

তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ঔষধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বারাসাতে 'সোমতীর্থ'

এক সুদৃশ্য সরোবরের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট দেবাদিদেব মহাদেব। শূলপাণির জটাজাল থেকে উত্থিত হয়েছে মা গঙ্গার ধারা, পিছনে কৈশাল-পর্বতের গায়ে সফেন ঝরণার ধারা। দক্ষিণে শিবলিঙ্গের মন্দির শেষে কৈলাশ প্রদক্ষিণের সুড়ঙ্গপথ। নির্মাণশৈলী শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। তীর্থঘাটে স্নান করে মন্দিরে পূজা দেওয়া যায়। এক স্বর্গীয় পরিবেশ— বাংলার সূচীতে সংযোজিত হলো এক নতুন তীর্থস্থল।

এ কোনও কবির কল্পনা নয়, বাস্তবেই দলে দলে পুণ্যার্থী নরনারী ছুটে আসছেন নতুন তীর্থস্থল দর্শনের জন্য। শিব-চতুর্দশীর প্রাক্কালে সোমতীর্থের শুভ উদ্বোধন করলেন বারাসাতের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার ও আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। এই শুভ প্রচেষ্টার মূল যন্ত্রী স্থানীয় পৌরপিতা অরুণ ভৌমিক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন স্বনামধন্য শিল্পী। পৌরসভায় পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বে আছেন। তার অনেক দিনের স্বপ্ন, শিল্পচেতনা, কলাদক্ষতা আজ বাস্তবে এক দিব্য রূপ পেল যা অরুণ ভৌমিককে অমর করে রাখবে। লিঙ্গমন্দিরের পঁচিশটা চূড়ায় উড়ছে ২৫টা গৈরিক পতাকা, মাথায় শক্তির প্রতীক ত্রিশূল।

পথ নির্দেশ : বারাসাত বা হৃদয়পুর স্টেশন থেকে ১০ মিনিটের পথ।

ইছাপুরে সেবা বিভাগের বৈঠক

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্তের উপস্থিতিতে দুর্গাপুর মহকুমার ইছাপুর গ্রামে সেবা বিভাগের একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে ওই অঞ্চলের ১৬টি প্রকল্পের সেবাব্রতী এবং ইছাপুর গ্রাম বিকাশ সমিতির কার্যকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ইছাপুরে সেবা বিভাগের ভবন নির্মাণের জন্য ৪ কাঠা জমি ক্রয় করা হয়েছে।

তারা মা'র মন্দির প্রতিষ্ঠা

গত ১ মার্চ দুপুরে শিলিগুড়ির লাগোয়া ৮০ ঘর মোড়ের কাছে পূর্ব চয়নপাড়াতে স্থানীয় এলাকাবাসী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের সহায়তায় এক সুন্দর শ্রীশ্রী তারা মায়ের মন্দির উদ্বোধন হলো। মন্দির উদ্বোধন করলেন জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অক্ষয়ানন্দজী মহারাজ এবং ভক্তবৃন্দের কাছে 'তার মা' বলে পরিচিত শ্রীমতী দেবপ্রতিমা মজুমদার। উদ্বোধনের পরে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য প্রসঙ্গ অক্ষয়ানন্দজী মহারাজ বলেন, ''মন্দির লোক-কল্যাণ ও মানব জীবনের মুক্তিপথে প্রধান সহায়ক। মানুষের জীবনের অন্তিম ও একমাত্র লক্ষ্যই হলো মোক্ষলাভ। শাস্ত্রমতে ৮৪ লক্ষ জন্মের পরই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ হয়। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু পরিচালন এতদঞ্চলে সুন্দর পরিবেশ ও ভক্তিভাবের বিস্তার হবে।'' বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিলিগুড়ির কার্যকর্তা বাসুদেব পাল তাঁর ভাষণে তিন মা-কে সমানভাবে ভক্তি, সম্মান এবং সেবার আহ্বান জানান— দেবী মা তারা, জন্মদাত্রী মা ও দেশজননী ভারতমাতা। তাহলে সবকিছু ভালোভাবে চলবে।''

মন্দিরের প্রধান উদ্যোক্ত বিশিষ্ট সরকারি অফিসার সুকুমার শিকদার মন্দির নির্মাণে সাহায্যকারী সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। স্থানীয় অঞ্চল প্রধান শ্রীমতী সুধা চট্টোপাধ্যায় মন্দিরের প্রয়োজনে যথাসাধ্য সহযোগিতার কথা বলেন। সব মিলিয়ে এক আনন্দময় পরিবেশ ছিল। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শচীন সরকার ও তাঁর সঙ্গীরা।

মঙ্গলনিধি

গত ২০ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলার বামনী গ্রামের স্বয়ংসেবক অশোক গোপ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব গোপের শুভ বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলাপ্রচারক ভীষ্মদেব মণ্ডলের হাতে। প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে অনেক স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ অমর কুমার ভদ্রের মাতৃদেবী রাধারানি ভদ্র গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বেহালার বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ৫ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি পূর্বেই দেহদানের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই মতো মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা পরেই তার মরদেহ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে দান করা হয়।

সীমা জাগরণ মঞ্চে অখিল ভারতীয় বৈঠক

গত ১০-১১ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের যোধপুর শহরে সীমা জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা বৈঠক হলো। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সীমাজগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংযোজক রাকেশ সিং, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য ইন্দ্রেশ কুমার এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৪২ জন প্রতিনিধি। এছাড়া যোধপুরের ১৫ জন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গ থেকে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সন্তোষ কুমার সরকার, বঙ্কিম কর্মকার, সুভাষ নন্দী ও জ্যোতির্ময় দেব। বৈঠকে উপস্থিত প্রতিনিধিদের রাকেশজী বলেন, ''চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সীমান্তে সীমান্ত ভয়ঙ্কর সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। দেশেও প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র পর্যায়ের কার্যকলাপ দেশবাসীর স্বাভিমানে ক্রমান্বয়ে আঘাত করে চলেছে।'' ইন্দ্রেশজী তাঁর বক্তব্যে দেশের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

কিশোরী বিকাশ শিবির

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, উত্তরঙ্গ সম্ভাগ বিভিন্ন সময়ে কিশোরী বিকাশ শিবিরের আয়োজন করে। গত ২৫ অক্টোবর কালিয়াগঞ্জের দরমানপুরে সারাদিনের শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিতি ৫২।

অনুরূপভাবে ২৩ ডিসেম্বর কালিয়াগঞ্জের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত শিবির হয়। সংখ্যা ৮৫। বিশেষ অতিথিরূপে বক্তব্য রাখেন কালিয়াগঞ্জ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ সুভাষ চক্রবর্তী এবং সমিতির জেলা সঞ্চালিকা সুজাতা চক্রবর্তী।

গত ১২ জানুয়ারি উদয়পুর বালিকা বিদ্যানিকেতনে দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত শিবির হয়। সংখ্যা ৮৫। বিদ্যানিকেতনের সহ-প্রধান শিক্ষিকা শীলা বসাক বক্তব্য রাখেন।

গত ৮ জানুয়ারি দুপুর ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত সম্বর্ধিনী অনুষ্ঠান শিলিগুড়ির সূর্যসেন কলোনিস্থিত সারদা শিশুতীর্থে অনুষ্ঠিত হয়। মা-বোনের উপস্থিতি ১২৫। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সত্যপদ পাল, অধ্যাপিকা কৃষ্ণা পাল ও সমিতির প্রান্ত সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার।

রাষ্ট্রীয় শিখর প্রতিভা সম্মান

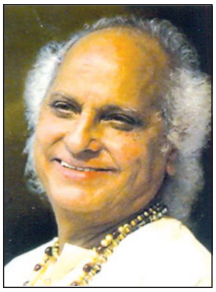

কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক-সাহিত্যিক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় প্রবর্তিত 'রাষ্ট্রীয় শিখর সম্মান' এবার প্রদান করা হবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিশ্ববিখ্যাত গায়ক, সঙ্গীত মার্তণ্ড এবং পদ্মবিভূষণ পণ্ডিত যশোরাজকে। আগামী ২৩ মার্চ ২০১৪, সকাল ১১টায় স্থানীয় ওসোয়াল ভবনে এই অনুষ্ঠানে সুরসম্রাজ্ঞী পদ্মভূষণ শ্রীমতি গিরিজাদেবীর হাত দিয়ে পণ্ডিতজীকে সম্মানিত করা হবে।

এই অনুষ্ঠানে কলকাতার কিছু সঙ্গীত সংস্থার পক্ষ থেকেও পণ্ডিতজীকে সম্মান জানানো হবে। উল্লেখ্য, গত বছর এই সম্মান জানানো হয়েছে অধ্যাত্ম জগতের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী এবং হরিদ্বারের ভারতমাতা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সত্যমিত্রানন্দ মহারাজকে।

শোক সংবাদ

হুগলী জেলার শেওড়াফুলি নগরের স্বয়ংসেবক এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলার সংযোজক সঞ্জয়দেবের মাতৃদেবী শিপ্রারানি দেব গত ১১ ফেব্রুয়ারি ৫১ বছর বয়সে পরোলোক গমন করেন। তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, ২ পুত্র, কন্যা, জামাতা, নাতিসহ অন্যান্য পরিজনদের রেখে গেছেন। সঞ্জয় অশৈশব স্বয়ংসেবক এবং তিন বছর সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন।

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

রূপান্তর-এর নৃত্যনাটিকা।

সংস্কার ভারতীর শিশু-কিশোর নাট্যমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন ॥ কমবেশি ১০০ জন শিশু-কিশোর, যাদের বয়স তিন থেকে চোদ্দ, গানে-নাচে অভিনয়ে মাতিয়ে দিল সারা সন্ধ্যা। গত ৩ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় এই দৃশ্যই দেখা গেল বাগবাজারের গিরিশ মঞ্চে। প্রতি বছর আরও নানা অনুষ্ঠানের মধ্যেও ছোট ছোট শিল্পীদের কথা সংস্কার ভারতী ভোলে না। বিভিন্ন স্কুলের ছোটদের নিয়ে নাট্যমেলার আয়োজন করে সংস্কার ভারতী। এই কথাটিই ওই দিনের উদ্বোধক প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী বলেন। তিনি বলেন এরা শুধু নাটক করে না, নানাবিধ সাংস্কৃতিক কাজে সারা বছর ব্যস্ত থাকে। এই প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী, বিধায়ক ভট্টাচার্য শতবর্ষ উদ্‌যাপন ইত্যাদি নানাবিধ অনুষ্ঠানের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

দি হোলি একাডেমির 'সাক্ষীশেয়াল'।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ঈশানী কুণ্ডুর নির্দেশনায় সংস্কার ভারতী গোবরডাঙ্গার কিশোরী শিল্পীরা 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী ভারতে নবজীবনম্' ভাবসঙ্গীতের সঙ্গে নাচলো। তাদের নৃত্যনির্মিতি অপূর্ব। এরপর নটরাজের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে নাট্যমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বিভাস চক্রবর্তী। প্রাককথনে সংস্কার ভারতীর সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় বলেন, পাঠ্যপুস্তকের ভারে নুয়ে পড়া ছেলেমেয়েরা অন্যদিকে তাকানোর সময় পায় না। স্বভাবতঃই সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ও রুচিবোধ গড়ে ওঠে না। সংস্কার ভারতী তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মঞ্চ ছেড়ে দেয় তাদের নাচ-গান-নাটক অভিনয়ের জন্য।

মানিকতলা-মুরারীপুকুরের প্রাক্‌প্রাথমিক বিদ্যালয় 'দি হোলি একাডেমি'র তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুরা অভিনয় করল উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর 'সাক্ষী শেয়াল'। অপূর্ব নাট্যরূপ দিয়েছেন চিরঞ্জিত ভদ্র। রেকর্ডেড সংলাপের সঙ্গে অপূর্ব দক্ষতায় ঠোঁট মিলিয়েছে ক্ষুদে শিল্পীরা। নির্দেশনায় ছিলেন সুপ্রীতি ভদ্র। সংস্কার ভারতী বাগুইহাটি শাখার কিশোর শিল্পীরা বিকাশ ভট্টাচার্যের নাটক 'জেগে ওঠ নব চেতনায়' মঞ্চস্থ করল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম জীবনের ঘটনা নিয়ে ছোটদের অভিনয় দর্শকদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়। নির্দেশনায় ছিলেন প্রদীপ দাস। পনেরো মিনিট সময়সীমায় বাঁধা অণুনাটক এখন অনেকেই করছেন। এর প্রচার ও প্রসারে 'অণুনাটক বিকাশ মঞ্চ' কাজ করে চলেছে। এদিন নব ব্যারাকপুরের 'মজলিশ' নাট্যদল তাদের কিশোর শিল্পীদের নিয়ে মঞ্চস্থ করল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অণুনাটক 'জীবন দাতা'। নির্দেশনায় ছিলেন সুভাষ দাস।

নাট্যমেলার সর্বশেষ নিবেদন বিধাননগর রূপান্তর-এর প্রযোজনা বিদেশি রূপকথা অবলম্বনে 'তুষারমালা বোন ও সাতটি বামনভাই' এক রঙ্গীন উপস্থাপনা। মঞ্চের একদিকে ফুলের বাগান আর একদিকে রানির ঘর ও আয়না— এই দুই জনের পর্যায়ক্রমে অভিনয় সকলকে মোহিত করে। নির্দেশনায় ছিলেন সুমনা পাল ভট্টাচার্য। সমস্ত ক্ষুদে শিল্পীর প্রয়োজন মতো পোশাক ও রূপসজ্জায় সাজিয়েছেন বিনয় চিত্রকর। আলোকসজ্জাতে উত্তম বিশ্বাস ও শব্দ প্রক্ষেপণায় ছিলেন হিমাংশু পাল। নাট্যমেলার প্রতিটি অনুষ্ঠানের নির্দেশকদের হাতে পুষ্পার্ঘ্য তুলে দেন বিভাস চক্রবর্তী।

সংস্কার ভারতী বাগুইহাটির নাট্যদৃশ্য।

শব্দরূপ-৭০৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

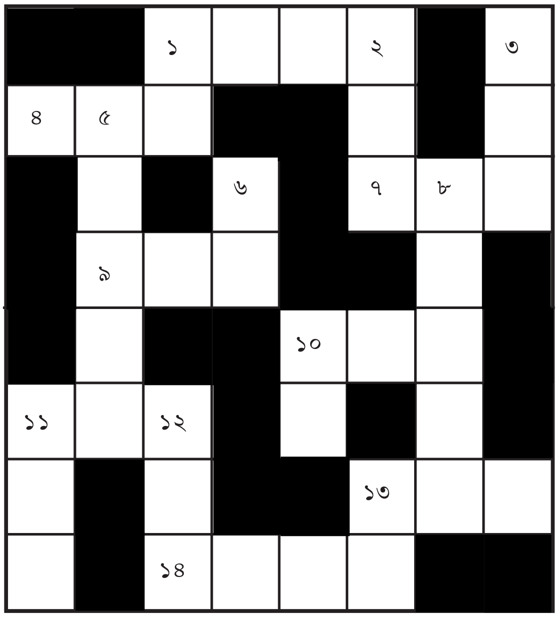

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি বিশেষ, যাতে পঞ্চ-মকার আবশ্যক, **৪.** 'শরৎ তোমার---আলোর অঞ্জলি' **৭.** মোটা লাঠি, **৯.** দেবতাকে নিবেদিত বা পূজ্য ব্যক্তির ভুক্তাবশিষ্ট বস্তু; অনুগ্রহ, **১০.** কৃষ্ণ, **১১.** 'আমি তখন ছিলেম—ঘুমের ঘোরে/যখন বৃষ্টি নামল', **১৩.** রঙ্গরস, চতুরালী; ছড়া কাটা, **১৪.** প্রথম দর্শনে চোখের তারায় তারায় মিল হইলেই যে বন্ধুত্ব জন্মে।

উপর-নীচ : ১. তীর, শর, **২.** জিহ্বা, **৩.** একটি নির্বিষ সাপ, **৫.** অলকানন্দা ও মন্দাকিনী নদীর সঙ্গমস্থলে বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ, **৬.** ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র, **৮.** তিব্বতের আধ্যাত্মিক প্রধান, সেইসঙ্গে শাসনতন্ত্রের শীর্ষ পদাধিকারী, **১০.** শরৎ-এর সাদা ফুল, **১১.** এ নাকি মিষ্টি খায় না, **১২.** কোমলতা, নমনীয়তা, **১৩.** ধাই; আমলকী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭০২

■	বে	দ	ব	তী	■	■	স
ম	দ	■	■	ব	■	■	ম্পা
■	ব্যা	■	■	র	মা	প	তি
বা	স	ক	■	■	কা	■	■
■	■	লি	■	■	ল	লি	তা
স	ত্য	কা	ম	■	■	প্ত	■
র	■	■	ঙু	■	■	পা	লি
যূ	■	■	প	র	মা	দ	■

সঠিক উত্তরদাতা

সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

◻ ৭০৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৪ মার্চ, ২০১৪ সংখ্যায়

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ে ন
মাত্র দুই মিনিটে (ৈর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

আজ দেশে শক্তিশালী ও মজবুত সরকার চাই

ভোটদান অবশ্যই করুন
দেশের জন্য ভোটদান করুন।।

আপনার একটি ভোট দেশের জন্য
আপনার একটি ভোট পরিবর্তনের জন্য

যদি পরিবর্তনের পক্ষে হন তাহলে আপনার ভোটার কার্ডের নম্বরটি এই নম্বরে এস এম এস করুন— ০৯২২৩০০৯০০০

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ২২

স্বামীজীর জন্মের দেড়শো বছরকে মনে রেখে আই আই টি-ছাত্রদের ইয়ুথ কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পাশ করার পরে আই আই টি-র ছাত্র-ছাত্রীরা বিলাসবহুল জীবন যাপন এবং মাস পোহালে মোটা বেতনের চাকরি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, তাঁরা নাকি খুব কেরিয়ার সচেতন, দেশ নিয়ে ভাবেন না— এমনই প্রচলিত অনুযোগ শোনা যায় আই আই টি ছাত্রদের সম্পর্কে। ব্যতিক্রমী হিসাবে উদাহরণ তুলে ধরা হয় দিল্লীর সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পারিক্কর এবং কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী জয়রাম রমেশের কথা, কারণ এঁরা প্রত্যেকেই আই আই টি-র প্রাক্তন ছাত্র। তবে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বা জয়রাম রমেশদের কাছে খবর আছে কিনা জানা নেই যে— দেশকে নিয়ে ভাবতে, দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের উন্নত পরিকল্পনা দিতে, সর্বোপরি বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষে ভারত কেন্দ্রিক চিন্তাধারাকে চারিদিকে প্রসারিত করতে এগিয়ে আসছেন কয়েক-শো সদ্য পাশ আই আই টি পড়ুয়া, যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে শুরু হতে চলেছে এক গ্লামারস্ ইয়ুথ কনভেনশন যার পোশাকি নাম— Indgenius (ইনড্‌জিনিয়াস)।

হ্যাঁ, এমনটাই হতে চলেছে গার্ডেন সিটি অফ ইন্ডিয়া বেঙ্গালুরুতে। বেঙ্গালুরুস্থিত প্রশান্তি কুটিরম্-এর SVYASA বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই কনভেনশন চলবে তিনদিনব্যাপী ১৪ মার্চ থেকে ১৬ মার্চ। যেখান থেকে উঠে আসবে বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারত গঠনের পরিকল্পনা, সৌজন্যে আই আই টি-র ছাত্ররা। আই আই টি ছাড়াও বহু সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব থাকবে দেশের সমস্ত এন আই টি এবং রিসার্চের ক্ষেত্রে এক নম্বরে থাকা আই আই এস সি থেকেও। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে এখন ছাত্র যুবরাও এই ইনটেলেকচুয়াল কনভেনশনে প্রত্যাশিত।

নাম পঞ্জিকরণ চলেছে অনলাইন এবং অফ লাইন দুই ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে। হাইপ্রোফাইল এই কনভেনশনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রচার চলছে ফেসবুকে, গুগল প্লাস থেকে আরম্ভ করে ট্যুইটার প্রভৃতি সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতে।

আমন্ত্রিত থাকছেন অলিম্পিকে রুপোজয়ী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, প্রাক্তন ডি আর ডি ও ডঃ ভি কে সারস্বত, ডি আই সি সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা তথা পদ্মশ্রী প্রাপ্ত মিলাদ কামলে, পরমবীরচক্র প্রাপ্ত সঞ্জয়কুমার, দত্তাত্রেয় হোসাবলে, সুনীল আম্বেকর প্রমুখ। দুঃস্থ পরিবারের মেধাবী ছেলেদের ফ্রি'তে আই আই টি জয়েন্টের কোচিং করান যিনি, পাটনার সেই আনন্দকুমারও এখানে আমন্ত্রিত অতিথি। প্রত্যেক আমন্ত্রিত অতিথির মুখ থেকে শোনা যাবে--- দেশ গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা, ভারতের গৌরবময় অতীত, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দের বাণীর প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গেও প্রতিনিধিদের আলাপ করানো হবে, তুলে ধরা হবে ওই সংস্থাগুলির দৈনন্দিন কার্যাবলী। Paper Presentation থাকছে বিচার ব্যবস্থায় সংস্কার, পুলিশি সংস্কার, নির্বাচনী সংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার, শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার ইত্যাদি বিষয়— যেখানে দেশের এই নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্ররা তুলে ধরবেন এই বিষয়গুলির উপর তাঁদের সুচিন্তিত মতামত। ভারত সম্পর্কে তাঁদের ধারণার কথাও শোনা যাবে এই কনভেনশনে। আই আই টি, আই আই এস সি-র ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেবেন দেশের বর্তমান অর্থনীতি, নিরাপত্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ভাবনা, পরিবেশ, মানব সম্পদ উন্নয়ন (HRD) ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর। তিনদিন ব্যাপী এই কনভেনশনে থাকবে বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনীর উপর একটি প্রদর্শনী। সমগ্র কনভেনশনের আলোচনা এবং Paper Presentations -এর উপর একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হবে। পরবর্তীকালে যা সরকার থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সাংসদদের কাছে পাঠানো হতে পারে। কনভেনশনকে সফল করতে সহযোগী সংগঠন হিসাবে কাজ করছে 'থিঙ্ক ইন্ডিয়া'। থিঙ্ক ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় আহ্বায়ক আশিস চৌহ্বান জানান— "আলাদা আলাদা প্রতিভার যুবাদের দেশ গঠনের কাজে একই ছাতার তলে নিয়ে আসাই আমাদের উদ্দেশ্য।"

পুরো কনভেনশনে আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ডঃ শ্রীভলসা কোলাথাইয়ার, যিনি বর্তমানে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন (ধানবাদ)-এর অধ্যাপক। কনভেনশনের ব্যাপারে তাঁকে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান--- "যুবাদের প্রতিভার জোরেই দেশ এগোতে পারে। আই আই টি-র ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বিদেশে না গিয়ে এদেশে অধ্যাপনা করে মানুষ তৈরির কারিগর হতে পারে সেটাই আমাদের প্রচেষ্টা এবং তাই এই কনভেনশন।"

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
10 March - 2014

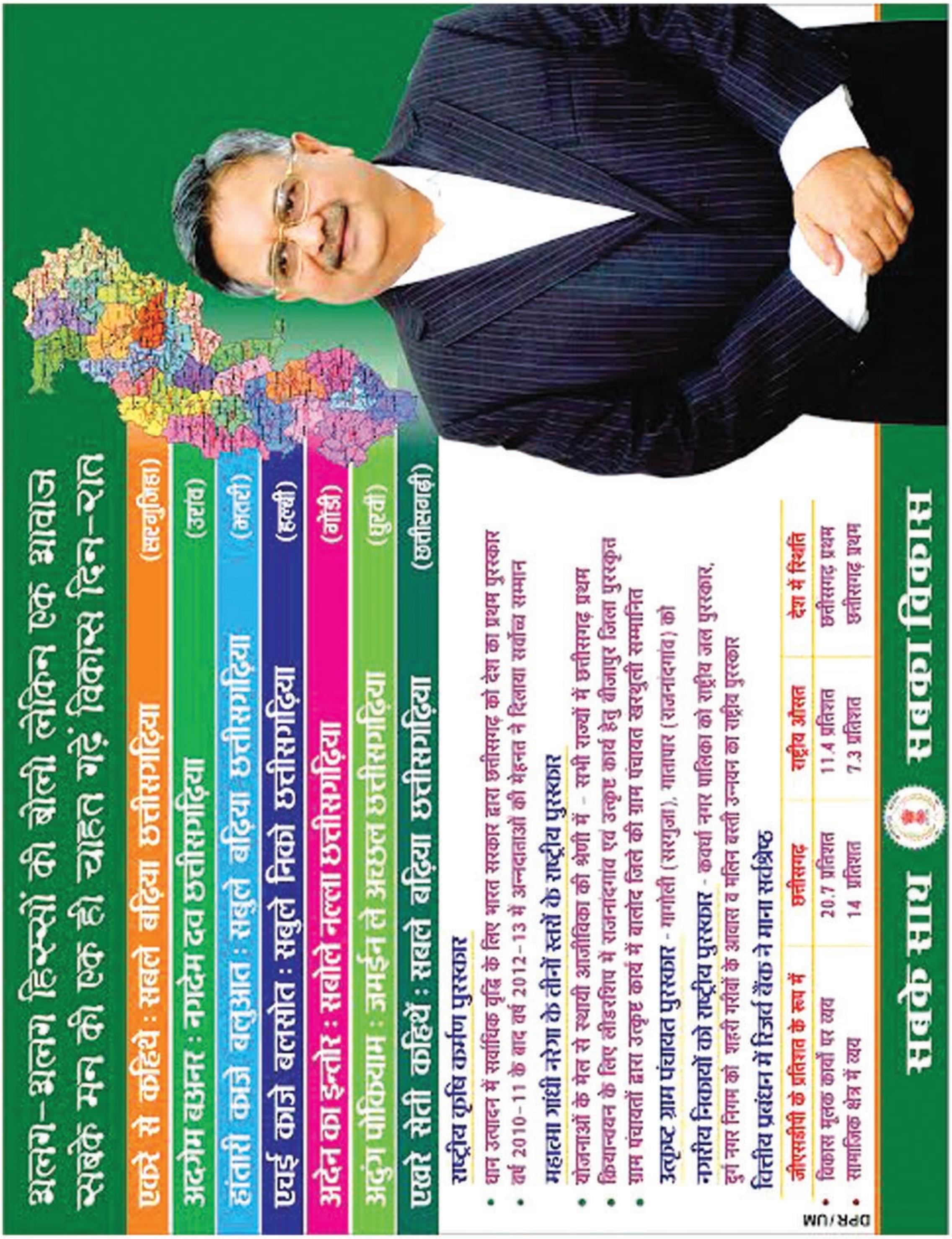

দাম : ১০.০০ টাকা